হিমু এবং একটি রাশিয়ান পরী

হুমায়ূন আহমেদ

ভূমিকা

আমাদের কালচারে অনুরোধে ঢেঁকি গেলার ব্যাপারটা আছে। লেখালেখি জীবনের শুরুতে প্রচুর ঢেঁকি গিলেছি। শেষের দিকে এসে রাইস মিল গেলা শুরু করেছি। **"হিমু এবং একটি রাশিয়ান পরী"** তার উদাহরণ। বৎসরে আমি একটাই হিমু লিখি। বিশ্বকাপ বাংলাদেশে হচ্ছে বলে দু'জন হিমু। একজন মাঠে বসে খেলা দেখবে অন্যজন পথে পথে হাঁটবে।

হুমায়ূন আহমেদ

নুহাশপল্লী

মাজেদা খালা গলা নামিয়ে, প্রায় ফিসফিস করে বললেন, পরী দেখবি?

আমি বললাম, কি রকম পরী?

ডানাকাটা পরী।

আমি বললাম, ডানা কাটার ঘা শুকিয়েছে, না-কি ঘা এখনো আছে? শরীরে ঘা নিয়ে ঘুরছে, এমন পরী দেখব না।

মাজেদা খালা বিরক্ত মুখে বললেন, 'তুই কি সহজভাবে কোনো কথা বলতে পারিস না। ডানাকাটা পরী দেখতে চাস না-কি চাস না? হ্যাঁ কিংবা না বল।'

ডানাওয়ালা কিংবা ডানাকাটা কোনো ধরনের পরীই আমার দেখতে ইচ্ছা করছে না। খালাকে খুশি করার জন্যে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

খালা আমার সামনে 3R সাইজের একটা ছবি রেখে বললেন, এই দেখ ডানাকাটা পরী।

আমি দেখলাম গোঁফওয়ালা এক পরীর ছবি। তার মাথার চুল ব্রাসের মত ছোট করে কাটা। চাইনিজ কাটের হলুদ রঙের একটা সার্ট তার গায়ে। সার্টের নিচে নীল রঙের হাফ পেন্ট। পরীর হাতে টেনিস র‍্যাকেট। কপালে ঘাম দেখে মনে হল টেনিস খেলে এসেছে।

খালা বললেন, কেমন দেখলি?

আমি বললাম, ভাল। গোঁফওয়ালা পরীর কথা আগে শুনি নি। ছবি দেখে ভাল লাগল। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি থাকলে আরো ভাল লাগতো।

খালা গলার স্বর আবারো খাদে নামিয়ে বললেন, ছেলে না, এ মেয়ে। গোঁফ লাগিয়ে ছেলে সেজেছে। তার আসল ছবি দেখলে মাথা ঘুরে সোফায় কাত হয়ে পড়ে যাবি। দশ মিনিট উঠতে পারবি না। বুক ধড়ফড়ানি রোগ হয়ে যাবে। এই দেখ আসল ছবি। এখন বল এই মেয়ে যদি পরী না হয় তাহলে পরী কে?

আমি বললাম, হুঁ।

শুধু হুঁ বললি। সুন্দর একটা কথা বল।

আমি বললাম, "কে বলে শারদ শশি এ মুখের তুলা পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলো।"

এর মানে কি?

এর মানে হল শরৎ রাতের চাঁদও এই মুখের তুলনা হবে না। শরতের পূর্ণ চন্দ্র পড়ে থাকবে এই তরুণীর পায়ের নখের কাছে।

বাহ্। তুই বানিয়েছিস?

কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন। রূপবতী মেয়ে দেখলে উনার মাথা ঠিক থাকত না। নিজে বিয়ে করেছিলেন এক তড়কা রাক্ষসীকে। ধুমসি আলুর বস্তা। গাত্র বর্ণ পাতিল কালো। দু'টা দাঁত খরগোসের মত সব সময় ঠোঁটের বাইরে।

ভারতবাবু এই মেয়েকে বিয়ে করল কেন?

মহিলার উচ্চবংশ বলে বিয়ে করেছিলেন। কবিরা আবার বংশের দিকে দুর্বল।

রাক্ষুসীর কথা বাদ দে এলিতা মেয়েটাকে বিয়ে করবি? ধান্দাবাজি না, এক কথায় জবাব দে। হ্যাঁ না-কি না?

পরীর নাম এলিতা?

হুঁ। বাবা-মা রাশিয়ান, এলিতা জন্মসূত্রে আমেরিকান। ফটোগ্রাফির উপর কোর্স করেছে। বাংলাদেশে আসছে স্টিল ছবি তুলতে। নাম The Food. ঢাকায় আসবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। তুই হবি তার গাইড।

আমিতো ইংরেজিই জানি না। গাইড হব কি ভাবে?

খালা বললেন, ঐ মেয়ে টিচার রেখে বাংলা শিখে তারপর আসছে। ওরা যা করে সিরিয়াসলি করে। তোর মত অকারণে রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটে না। বাংলাদেশে আসবে তাই বাংলা শিখেছে। তার চায়না যাওয়ার প্রোগ্রাম থাকলে চায়নিজ শিখতো। রশিয়ান ভাষা সে জানে।

আমি বললাম, ভাষাবিধ পণ্ডিত পরী বিয়ে করা বিপদজনক তারপর তুমি যখন বলছ বিয়ে করব। বিয়ে কি মেয়ে ঢাকায় পৌছার পরপরই হবে? মেয়ে জানে যে আমাকে বিয়ে করছে?

মেয়ে কিছুই জানে না। তুই সারাক্ষণ মেয়ের সঙ্গে থাকবি। তোর উদ্ভট উদ্ভট কথাবার্তা শুনে মেয়ে তোর প্রেমে পড়ে যাবে। প্রেম একটু গাঢ় হলেই আমি কাজি ডেকে বিয়ে দিয়ে দেব। তুই মেয়ের হাত ধরে চলে যাবি আমেরিকা। তোর একটা গতি হয়ে যাবে। এখন বুঝেছিস আমার প্ল্যান।

এই মেয়ের সঙ্গে তুমি জুটলে কি ভাবে?

ইন্টারনেটে। এলিতা আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড। তার বয়স একুশ। তার একটাই দুঃখ এখনো না-কি সে কোনো বুদ্ধিমান ছেলে দেখে নি। তার কাছে পুরুষ মানেই গাধা।

ছেলে সেজেছে কেন?

বাংলাদেশে আসবে এই জন্যে ছেলে সেজেছে। ছেলে সেজেই আসবে। যতদিন থাকবে ছেলে সেজে থাকবে। সে এক নিউজে শুনেছে গরিব দেশে শাদা চামড়ার মেয়ের একা যাওয়া মানেই গ্যাং রেপড হওয়া। এলিতা ভেজিটেরিয়ান। সকালে কি নাস্তা খায় জানিস তিনটা কাঁচা ওকরা।

ওকরা কি জিনিস?

ওকরা হল ঢ্যাড়স।

দুপুরে কি খায়? অর্ধেকটা কাঁচা লাউ?

হিমু ফাজলামি বন্ধ। আমি এই মেয়েটার বিষয়ে সিরিয়াস। আমি চাই তুইও সিরিয়াস হবি। তোদের দু'জনের বিষয়টা মাথায় কিভাবে এসেছে জানিস?

স্বপ্নে পেয়েছ!

ও আল্লা! সত্যিতো। কিভাবে বললি? আসলেই স্বপ্নে পেয়েছি এলিতা যখন জানলো সে ঢাকায় আসছে তখনি স্বপ্নটা দেখলাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছি। হাতে গল্পের বই। গল্প পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি তখন স্বপ্নটা দেখলাম। একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে তোরা দু'জন যাচ্ছিস। পেছনে ব্যান্ডপার্টি। তোর পরনে স্যুট টাই। এলিতার পাশে তোকে মোটেই বেমানান লাগছে না?। সুন্দর লাগছে। এলিতা পড়েছে লাল জামদানি। তোর গলার টাইটা লাল।

আমি খালাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, স্যুট লাল টাই কোথায় পাব?

খালা বললেন, ড্রেস নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না। তোর খালুর স্যুট টাই আমি আলাদা করে রেখেছি।

মাপে হবে না।

একটু উনিশ বিশ হবে। কারো চোখে পরবে না। আমার সামনে পরতো দেখি। টাই এর নট বাঁধতে পারিস?

না।

আমি বেঁধে দিচ্ছি। শিখে নে।

এখন পরতে হবে?

হ্যাঁ। তোর খালু বাসায় ফেরার আগেই স্যুট টাই নিয়ে বিদায় হয়ে যা। এখন থেকে সারাক্ষণ স্যুট টাই পরে থাকবি। নয়তো আসল দিনে ঝামেলায় পরবি গা কুটকুট করবে। টাই গলায় ফাঁসের মত লাগবে।

স্যুট টাই পরলাম। খালা বললেন, কোটটা সামান্য লুজফিটিং হয়েছে। এটাই ভাল। আজকাল লুজফিটিং-এর চল। যা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখ তোকে কি সুন্দর মানিয়েছে। তোর চেহারা যে এত সুন্দর আগে খেয়াল করি নি।

আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি–নকল হিমু। আয়নার হিমুকে মনে হচ্ছে এই হিমু ব্রিফকেস নিয়ে ঘুরে। সে বিরাট ধান্দাবাজ, সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে যায়, বোতল খায়।

খালা বললেন, নিজেকে দেখেতো মুগ্ধ হয়ে গেছিস। পুরুষ মানুষকে বেশিক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখতে হয় না, চরিত্র খারাপ হয়। এখন জুতা পর। জুতা ফিট করে কি-না দেখি।

অনেক চেষ্টা করেও জুতা পায়ে ঢুকানো গেল না। মোজাসহ, মোজা ছাড়া নানানভাবে চেষ্টা করা হল। খালা বললেন, টাকা দিচ্ছি একজোড়া জুতা কিনে নিবি। ব্ল্যাক সু কিনবি। নিচে গাড়ি আছে। গাড়ি নিয়ে তোর খালুর এই স্যান্ডেলটা পড়ে চলে যা। জুতার দোকানে গাড়ি থেকে নামবি। কিছুক্ষণ স্যান্ডেল পরা থাকলে কিছু হবে না।

আমি গাড়ি এবং স্যান্ডেল ছাড়াই বের হলাম। হিমুর কিছুটা আমার মধ্যে থাকুক। স্যুট টাইয়ের সঙ্গে খালি পা।

ঢাকা শহর বদলে গেছে। কিভাবে বদলেছে কতটুকু বদলেছে?

ক) ঢাকা শহরের চলমান মানুষ এখন কেউ কারো দিকে তাকায় না। আমি আধঘণ্টার উপর স্যুট পরে খালি পায়ে হাঁটছি কেউ বিষয়টা ধরতে পারছে না। কেউ আমার পায়ের দিকে তাকাচ্ছেই না।

খ) ঢাকা শহরে মুচি সম্প্রদায় বলে এক সম্প্রদায় ছিল। তারা প্রথমে তাকাতো পায়ের দিকে। পায়ের জুতা স্যান্ডেলের অবস্থা দেখত। তারপর তাকাতো মুখের দিকে। জুতা ওয়ান টাইম আইটেম হয়েছে বলে মুচি সম্প্রদায় বিলুপ্ত। জুতার দিকে তাকিয়ে থাকার কেউ নেই।

গ) ঢাকা শহরের মানুষের বিস্মিত হবার ক্ষমতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। দু'জন আমাকে আপাদমস্তক দেখেছে। একজন দেখে হাই তুলল। দ্বিতীয় জন পানের পিক ফেলে উদাস হয়ে গেল।

তবে শিশুদের মধ্যে বিস্মিত হবার ক্ষমতা কিছুটা এখনো আছে। স্কুল ফেরত এক বালিকা অনেক ঝামেলা করে তার মা'র দৃষ্টি আমার খালি পায়ের দিকে ফেরাল। বিড়বিড় করে কিছু বলল। মা ধমক দিয়ে তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বালিকা যাবে না। কাজেই আমি এগিয়ে গেলাম। আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, খুকি তোমার কি খবর?

মেয়েটা সামাজিকতার ধার দিয়ে গেল না। অবাক হয়ে বলল, আপনার পায়ে জুতা নেই কেন?

আমি বললাম, আমি জুতা আবিষ্কারের আগের মানুষ বলে পায়ে জুতা নেই।

মেয়ের মা তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললেন, তানিজা চলতো।

তানিজা বলল, খালি পায়ে হাঁটলে অসুখ হয় আমার টিচার বলেছেন।

আমি বললাম, তানিজা তাকিয়ে দেখ ঢাকা শহরের বেশির ভাগ ভিক্ষুক খালি পায়ে হাঁটে। এদের অসুখ হয় না।

মেয়ের মা আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, প্লীজ আমাদের বিরক্ত করবেন না।

আমি বললাম, বিরক্ত করছি না গল্প করছি। আপনি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনার কি ধারণা আপনার মেয়েকে আমি ছিনিয়ে নিয়ে যাব। তারপর টেলিফোন করে বলব তানিজাকে ফেরত পেতে হলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা

নিয়ে সন্ধ্যার পর আজিমপুর গোরস্তানের কাছে চলে আসবেন। র‍্যাব বা পুলিশে খবর দিলে মেয়েকে জীবিত পাবেন না।

কেন আপনি অকারণে কথা বলে যাচ্ছেন? কেন আমাদের বিরক্ত করছেন? আপনার সমস্যা কি?

আমার একটাই সমস্যা পায়ে জুতা নেই। স্যুট টাই পরে খালি পায়ে হাঁটছি। এ ছাড়া কোনো সমস্যা নেই। তানিজার টিচার আবার বলেছেন খালি পায়ে হাঁটলে অসুখ হয়। এটা নিয়েও সামান্য টেনশানে আছি।

মেয়ের মা মেয়েকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমিও তাদের পেছনে পেছনে যাচ্ছি। একটা খেলা শুরু হয়েছে। খেলাটার শেষ দেখা দরকার। রান করি বা না করি ক্রিজে টিকে থাকতে হবে। আশরাফুলের মত শূন্য রানে আউট হলে চলবে না।

মহিলা কয়েকবারই চেষ্টা করলেন, রিকশা ঠিক করতে। কোন রিকশা রাজি হল না। মহিলা হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একের পর এক ইয়েলো ক্যাব তাকে পাস কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, থামাচ্ছে না। মহিলা হাঁটা শুরু করেছেন। আমিও তাদের সঙ্গে হাঁটছি।

তানিজা মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসছে। আমি তার হাসি ফেরত দিচ্ছি। হাসাহাসির সময় মেয়ের মা 'বাঘিনি Look' দিচ্ছেন। সাধারণ বাঘিনি না, আহত বাঘিনি। যে কোনো সময় আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। আমি তাদের পেছনে পেছনে কলাবাগানের গলির ভিতর ঢুকে গেলাম। মহিলা নিজের বাড়ির সামনে চলে এসেছেন বলে স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন। আতংকে চেহারা কালো হয়ে গিয়েছিল, চেহারায় কিছুটা জেল্লা ফিরে এসেছে। তিনি বাড়ির গেটে হাত রাখতে রাখতে বললেন, অনেক যন্ত্রণা করেছেন আর কত? এখন যান।

আমি বললাম, এক জোড়া স্পেয়ার জুতা কি আপনাদের হবে? জুতা পরে চলে যেতাম। তানিজা বলল, বাবার অনেকগুলো জুতা আছে আপনি নিয়ে যান।

তানিজার মা ঠাস করে মেয়ের গালে চড় দিয়ে তাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেলেন। ধরাম করে দরজা বন্ধ করলেন। আমি গেট ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মহিলা কি করবেন বুঝতে পারছি না। স্বামীকে খবর দিবেন, পুলিশকে খবর দিবেন। বিরাট ক্যাঁচাল শুরু হবে।

খারাপ কি? আমিতো এখনো ক্রিজে আছি। দরজা বন্ধ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও আনন্দ আছে। বাড়ির ভেতরের মানুষদের টেনশানে ফেলার আনন্দ। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে অন্যদের টেনশানে ফেলে সে আনন্দ পায়। সৃষ্টিকর্তাও আমাদের টেনশানে ফেলে আনন্দ পান বলেই মানবজাতি সারাক্ষণ টেনশানে থাকে।

মানুষের মহত্তম গুণের একটির নাম কৌতূহল। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যের মূলে আছে মানুষের অপার কৌতূহল। ঢাকা শহরের মানুষরা এই মহৎগুণের অধিকারী। তবে এই মহৎগুণের কারণে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যে তাদের কিছু যে হয়েছে তা-না। ঢাকা শহরের মানুষের কৌতূহল ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ। গরমের সময় কেউ যখন শসা খায় তখন তাকে ঘিরে পঞ্চশজন মানুষ দাঁড়িয়ে থেকে শসা খাওয়া দেখে। আখের রস বের করা যন্ত্র ঘিরেও চল্লিশ পয়তাল্লিশজন কৌতূহলী মানুষ সব সময় দেখা যায়। শ্রমিকরা যখন রাস্তা খুঁড়ে পাইপ বসায় তখন শ'খানেক মানুষকে রাস্তার দু'পাশে বসে থাকতে দেখা যায়।

কৌতূহলের কারণেই আমাকে ঘিরে পঁচিশ ত্রিশজন মানুষ দাঁড়িয়ে গেল। কৌতূহলী মানুষরা সংঘবদ্ধ থাকে এবং তাদের একজন লিডার থাকে। এখানকার লিডারের মাথায় বাউলদের মত লম্বা চুল। তিনি ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। বাতাসে তার বাবড়ি চুল নাচছে। অত্যন্ত বলশালী মানুষ। পাঞ্জাবী পরা, পাঞ্জাবীর হাতা গোটানো। দেখে মনে হয় ঘোসাঘুসির জন্যে প্রস্তুত। তিনি আমার কাছে এসে বললেন, ভাইসাব অনেকক্ষণ আপনি এই বাড়ির গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘটনা কি বলুনতো। কোনো সমস্যা? আমার নাম এ আলম।

আমি বললাম, এই বাড়ির একটা বাচ্চা মেয়ের নাম তানিজা। সে তার বাবার এক জোড়া জুতা আমাকে দিবে বলেছিল। জুতার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। জুতা দিচ্ছে না।

আলম আমার খালি পায়ের দিকে তাকালেন। মনে হচ্ছে তিনি মর্মাহত। ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, জুতা দিবে না। এটা কেমন কথা। অবশ্যই জুতা দিতে হবে।

তিনি মাথার বাবড়ি চুলে একটা বড় ধরনের ঝাঁকি দিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে তেজি গলায় বললেন, দেখুন কি অবিচার। একটা লোক খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জুতা দিচ্ছে না।

কৌতূহলী জনতাকে জুতা দিচ্ছে না শুনে মর্মাহত বলে মনে হল। তারা বলল, জুতা দিতে হবে। জুতা না দিয়ে পার পাওয়া যাবে না।

আধ ঘন্টার মাথায় দেড়শ'র মত লোক জমে গেল। গলির রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। জনতার মধ্যে একদলকে মনে হচ্ছে জঙ্গি ভাবাপন্ন। তারা একটু পরপর হুংকার দিচ্ছে জুতা দে। জুতা দে। জুতা না দিলে বাড়ি জ্বালায়া দিমু।

এর মধ্যে অনেক ঝামেলা করে সাদা রঙের প্রায় নতুন একটা প্রাইভেট কার ঢুকেছে। ড্রাইভার কয়েকবার হর্ণ দিতেই জঙ্গি জনতা গ্রুপ খেপে গেল। প্রাইভেট কারে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। ড্রাইভার দরজা খুলে পালাতে যাচ্ছিল। দৌড়ে তাকে ধরা হল। মেরে আধমরা করে জ্বলন্ত গাড়ির পাশে শুইয়ে রাখা হল।

আলম সাহেব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন–

'বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম। আল্লাহপাক বলেছেন, মা সাবেরিনা। অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করুন। আপনার অস্থির হবেন না। ধৈর্য ধারণ করুন। আমি নিজে ঐ বাড়িতে যাচ্ছি। তাদেরকে অতি ভদ্রভাবে জুতা দিতে বলব। যদি জুতা না দেয় তাহলে আমরা হার্ড লাইনে যাব। আমরা দাবি আদায় করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।'

এর মধ্যে একটা লাল রঙের গাড়িকে গলির মোড়ে দেখা গেল। যদিও জনতা ধর ধর করে ছুটে গেল। ড্রাইভার অতি বুদ্ধিমান। গাড়ি ঘুরিয়ে নিমিষে পালিয়ে গেল।

তিন জোড়া জুতা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ব্রাউন জুতা জোড়া ভাল ফিটিং হল। আমি জুতা পড়ে গলি থেকে বের হয়ে পড়লাম। আমার ধারণা ঘটনা আরো অনেক দূর গড়াবে। একটা ইয়েলো ক্যাব কব্জা করা হয়েছে। আগুন ধরানোর চেষ্টা চলছে। জাগ্রত জনতা আশেপাশের বেশ কয়েকটা বাড়ির দরজা ধাক্কাচ্ছে এবং শ্লোগান দিচ্ছে, জুতা দে। জুতা দে!

গলি থেকে বের হবার মুখে দেখি পুলিশের এবং র‍্যাবের গাড়ি গলিতে ঢুকছে। এই দুই গাড়ির পেছনে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে এ্যাম্বুলেন্সও যাচ্ছে।

পরদিন সকালে দুই হাতে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় আলম সাহেবের ছবি ছাপা হল।

দুর্ধর্ষ জুতা সন্ত্রাসী আলম আটক।

(নিজস্ব প্রতিবেদক)

কলাবাগানের গলিতে সন্ত্রাসী আলমকে আটক করা হয়েছে। সে তার দলবল নিয়ে জুতা সংগ্রহ অভিযানে নেমেছিল। প্রথমে সে গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর কাছে ভদ্র ভাষায় জুতা চাইতো। জুতা না দিলে বা জুতা দিতে দেরী হলে তার দল শুরু করত তাণ্ডব। তার দলের হাতে দু'টি প্রাইভেট কার ভস্মীভূত হয়েছে। প্রাইভেট কারের আরোহীরা নিজেদের পায়ের জুতা খুলে দিতে রাজি না হওয়ায় এই কাণ্ড।

সন্ত্রাসী আলমকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সে মুখ খুলছে না। বার বার বলছে নসিব সবই নসিব। ঘটনায় 'নসিব' নামধারী কেউ যুক্ত কি-না তাও অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

অনেকেই ধারণা করছেন জুতা সংগ্রহ অভিযানের পেছনে জুতা বিক্রেতাদের হাত আছে। তারা জুতার কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টায় আছে।

বাংলাদেশ পাদুকা বিক্রেতা সমিতির সভাপতি হাজি চাঁন মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভদ্র ভাষায় প্রতিবেদকের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু করেন। এক পর্যায়ে বলে উঠেন "... পুত তোরে আমি জুতা খিলায়া দিমু।"

প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে এমন ব্যবহার কখনো আশা করা যায় না।

বিষয়টার আমরা সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করছি।

একটি চৈনিক প্রবাদ আছে–"তুমি কাউকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিতে চেষ্টা করো যেন সে খাদ থেকে উঠতে না পারে।" এই প্রবাদের ব্যাখ্যা হল। খাদ থেকে উঠতে পারলে সে প্রতিশোধ নেবে। তাকে সেই সুযোগ না দেয়া।

আলম জুতা সন্ত্রাসী হিসেবে এখন থানা হাজতে। চৈনিক প্রবাদ অনুসারে আমার চেষ্টা করা উচিত যেন তিনি জামিনে বের হতে না পারেন। চৈনিক প্রবাদ আমাদের জন্যে খাটে না। আমাদের প্রবাদ হচ্ছে–কাউকে খাদে ফেলতে হলে তুমি নিজে তা করবে না। অন্যকে দিয়ে করাবে। খাদে পড়ে যাওয়া ব্যক্তির প্রতি প্রচুর সহানুভূতি দেখাবে। যার সাহায্যে তুমি অসহায় মানুষটিকে খাদে ফেলেছ এক পর্যায়ে তার নাম তুমি প্রকাশ করে তাকেও বিপদে ফেলবে। সব শেষে মানব চরিত্রের অবক্ষয় নিয়ে হা-হুতাশ করবে। দৈনিক পত্রিকায় চিঠি লিখবে। চিঠির শিরোনাম, দেশ আজ কোথায় যাচ্ছে ? দেশের বিখ্যাত কবিদের কবিতা শিরোনামে ব্যবহার করলে চিঠি সহজে ছাপা হবে। উদাহরণ, "উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।"

আমি ঠিক করলাম যে জুতাজোড়া নিয়ে এত কাণ্ড সেই জুতাজোড়া আলমকে দিয়ে আসব। পুলিশ ইচ্ছা করলে জুতাজোড়া আলামত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

স্যুট টাই পরে খালি পায়ে তৈরি হলাম। খালু সাহেবের প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে খানিকটা চমকালাম। প্যান্টের পকেটে মানিব্যাগ । বেশ কিছু হাজার টাকার নোট দেখা যাচ্ছে। সবুজ নোটও কিছু আছে। আমেরিকান ডলার। নানান ধরনের কার্ড। আমেরিকান এক্সপ্রেস, ভিসা জাতীয় হাবিজাবি। কিছু কাগজপত্র ক্লিপ দিয়ে আটকানো। নিশ্চয়ই অতি জরুরি।

মানিব্যাগ হারিয়েছে এই খবর খালু সাহেবের এর মধ্যে জেনে ফেলার কথা। বাসায় নিশ্চয়ই ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে।

খালু সাহেব হাইপারটেনশানের রুগী। আমি নিশ্চিত তিনি বিছানায় পড়ে গেছেন এবং তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। খবর নেবার জন্যে মাজেদা খালাকে টেলিফোন করলাম। খালা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তোর খালুর মানিব্যাগ পকেটমার হয়েছে।

বল কি? টাকা পয়সা কি পরিমাণ ছিল?

টাকা পয়সা নিয়ে তোর খালুর মাথা ব্যথা না। জরুরি একটা টেলিফোন নাম্বার লেখা ছিল, ঐ নাম্বারটা হারানোতেই সে অস্থির।

কার নাম্বার?

কার নাম্বার সে বলছে না।

নাম্বার মোবাইল ফোনে সেভ করা যায়। এই নাম্বার সেভ করা নেই কেন?

আমি কিভাবে বলব?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, খালু সাহেবের কোনো গোপন বান্ধবীর নাম্বার না তো?

পাগলের মত কথা বলছিস কেন? এই বয়সে তার আবার গোপন বান্ধবী কি?

খালা। একটা চিনা প্রবাদ আছে,

"বিড়াল, কাক এবং বৃদ্ধ পুরুষ এই তিন শ্রেণীকে বিশ্বাস করবে না।" চায়নিজরা মোক্ষম মোক্ষম প্রবাদ বের করে ছে। কোনটাই ফেলনা না।

খালা হতভম্ব গলায় বললেন, কি বলছিস তুই? তোর কথাবার্তা শুনেতো আমার হাত পা কাঁপা শুরু হয়েছে। আমি কি তোর খালুকে চেপে ধরব?

হাইপারটেনশানের রুগী বেশি চাপাচাপি করা ঠিক হবে না। মানিব্যাগ উদ্ধার হোক তারপর টেলিফোন রহস্যের জট খোলা হবে।

মানিব্যাগ উদ্ধার হবে কিভাবে?

দোয়া কালাম পড়তে থাক। বাসায় নিয়ামূল কোরান আছে না? সেখানে দেখ হারানো জিনিস ফেরত পাবার দোয়া আছে। এক মনে পড়তে থাক।

হিমু! তুইতো আমাকে বিরাট টেনশানে ফেলে দিলি। তুই এক্ষুনি বাসায় আয়।

এখন আসতে পারব না। থানা হাজতে যেতে হবে।

জুতা সন্ত্রাসী আলমকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত মনে হল। এক চোখে কালসিটা পড়েছে অন্যটা টকটকে লাল সেখান থেকে পানি পড়ছে। তিনি মেঝেতে পা ছড়িয়ে হাজতের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন, বিড় বিড় করছেন। নিশ্চয়ই কোনো দোয়া কালাম পড়ছেন। মসজিদ এবং থানা হাজত হল এক মনে আল্লাহকে ডাকার জায়গা।

আমি হাজতের লোহার শিকের ওপাশ থেকে বললাম, আলম ভাই কেমন আছেন?

তিনি চমকে তাকালেন তবে আমাকে চিনতে পারলেন না। ঝামেলার সময় দেখা মানুষকে ঝামেলা মুক্ত অবস্থায় বেশিরভাগ সময় চেনা যায় না।

আমি বললাম, মেরেতো দেখি আপনাকে তক্তা বানিয়ে ফেলেছে।

আপনি কে?

আমার নাম হিমু। আমি এসেছি আলামত জমা দিতে। জুতাজোড়া এনেছি। আপানাকে কোর্টে তুললে আলামত লাগবে। ওসি সাহেব কি বলেছেন? আপনাকে কোর্টে তোলা হবে? না-কি কয়েকদফা ডলা দিয়ে ছেড়ে দেবে?

আলম হতাশ গলায় বললেন, ওসি সাহেব দশ হাজার টাকা চেয়েছেন। টাকা দিলে মামলা কোর্টে উঠবে না। আমি দশ হাজার টাকা কই পাব? দু'টা প্রাইভেট টিউশানি করে মাসে আড়াই হাজার টাকা পাই। পত্র-পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়ে গেছে। টিউশানিওতো এখন থাকবে না।

আমি বললাম, না থাকারই কথা। সন্ত্রাসীকে কে শিক্ষক হিসাবে রাখবে? উন্নতমানের সন্ত্রাসী হলে একটা কথা ছিল। জুতা সন্ত্রাসী।

কি বিপদে পড়লাম দেখেন। রাতে কিছু খাই নাই। সকালেও না। টাকা দিলে এরা খানা এনে দেয়। টাকা নাই খানাও নাই।

আমি বললাম, মশার কামড় খাচ্ছেন না? মশা এবং ছারপোকা কামরালে ক্ষুধা কমে। বৈজ্ঞানিক সত্য। পাঞ্জাবীটা খুলে রাখুন। ভালমত মশা কামড়াক। কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন। ছারপোকা চলে আসবে।

আপনাকে চেনা চেনা লাগছে। আপনার পরিচয়?

আমি সেই লোক যার জন্যে আপনি জুতা সন্ত্রাসী হয়েছেন।

আলম অবাক হয়ে বলল, আপনি আলামত নিয়ে এসেছেন?

জি। আলামতের অভাবে পুলিশের বেশির ভাগ মামলা হয় নড়বড়ে। আমাদের উচিত পুলিশকে সাহায্য করা।

আলম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আজিব দুনিয়া।

পোশাকের যে আলাদা ইজ্জত আছে এটা কবি শেখ সাদী বুঝেছিলেন। রাজসভাতে রদ্দি জামা কাপড় পরে গিয়েছিলেন বলে তাকে সবার পেছনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি পরের দিন জরির ঝালড় দেয়া পোশাকে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সমাদরে প্রথম সাড়িতে বসানো হল। মনের দুঃখে তিনি লিখলেন–

"রাজসভাতে এসেছিলাম
বসতে দিলে পিছে
সাগর জলে শুক্তো ভাসে
মুক্তা থাকে নিচে।"

আমার স্যুট টাই দেখে ওসি সাহেব বিভ্রান্ত হলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, স্যার বসুন।

আমি বসতে বসতে বললাম, ভাল আছেন?

ওসি সাহেব হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়তে গিয়ে আমার খালি পায়ের দিকে তাকালেন। তাঁর ভ্রু কুঁচকে গেল। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমি বললাম, জুতা পায়ে নেই কিন্তু আমার সঙ্গে আছে। এই ব্রাউন পেপার ব্যাগে। দেখতে চান?

আপনার সমস্যা কি?

আমি বললাম, সমস্যা আমার না, সমস্যা দেশের। জুতা সন্ত্রাসী নামে নতুন সন্ত্রাসী গ্রুপ বের হয়েছে। এরা ভয়ংকর হয়ে উঠলে দেখা যাবে শুধু জুতা নিচ্ছে না। জুতার সঙ্গে পায়ের পাতা কেটে নিচ্ছে। মনে করুন আপনার বুট জুতা জোড়া নিয়ে গেল, বুটের ভেতর আপনার পায়ের পাতা।

ওসি সাহেব বললেন, আপনার কথাবার্তা অত্যন্ত এলোমেলো কি জন্যে এসেছেন বলুন।

আমি হাসিমুখে বললাম, হাজতে আলম নামে একজন বসে আছে। শুনলাম দশ হাজার টাকা ঘুস দিতে হবে। আপনারা ঘুসটা কি ক্রেডিট কার্ডে নেবেন? আমার কাছে ভিসা, আমেরিকান এক্সপ্রেস দুই-ই আছে।

ওসি সাহেব পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, আপনাদের ঘুস গ্রহণ কর্মকাণ্ড আরো আধুনিক করা উচিত। থানার দরজাতেই লেখা থাকবে, ভিসা কার্ড, আমেরিকান কার্ডে ঘুস লেনদেন করা যাবে। ভাল কথা ঘুসের উপর কি ভ্যাট আছে?

ওসি সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, এতক্ষণ আপনাকে চিনতে পারি নি। এখন চিনেছি। আপনি হিমু। স্যুট টাই এর ঢংটা কি জন্যে? আপনি কি জানেন পুলিশকে ঘুস সাধার অপরাধে আপনাকে হাজতে ঢুকাতে পারি?

আমি বললাম, জানি। আবার এও জানি চালে সামান্য ভুল করলে আপনি চলে যাবেন খাগড়াছড়িতে। স্ট্যান্ড রিলিজ। সেখানে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে বুনো হাতি। থানাওয়ালারা সব রাতে থানা ফেলে হাতির ভয়ে গাছে উঠে বসে থাকে। ঘুসখোর অফিসাররা মানসিকভাবে দুর্বল থাকে। হাতি দেখলেই তারা হাত পা ছেড়ে দেয়। ধুপ্পুস করে পাকা ফলের মত গাছ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। ওসি সাহেব আপনি অতি দুর্বল মনের একজন মানুষ। আমাকে হাজতে ঢোকানোর সাহস আপনি সঞ্চয় করতে পারছেন না। আমার সঙ্গে আপনি আপনি করে কথা বলছেন। বিশিষ্ট কেউ আমার পেছনে আছে এই ধারণা আপনার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। চা খাব। ওসি সাহেব চা খাওয়ানতো।

ওসি সাহেবের হাতে কাঠ পেনসিল। তিনি পেনসিল দিয়ে টেবিলে ঠক ঠক করছেন। মনের অস্থিরতার পেনসিল প্রকাশ বলা যেতে পারে। তিনি আমার বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এখনো বুঝা যাচ্ছে না। দুর্বল মনের মানুষের প্রধান ত্রুটি সিদ্ধাহীনতা, তবে তিনি যেভাবে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন তাতে মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টা হাজতে থাকতে হতে পারে।

তিনি হাতের পেনসিল টেবিলে নামাতে নামাতে বললেন, দুধ চা খাবেন না রং চা?

দুধ চা।

উইথ সুগার?

জি। প্রচুর হাঁটাহাঁটি করিতো টাইপ টু ডায়াবেটিস এখানো আমাকে ধরতে পারে নি।

ওসি সাহেব পেনসিল দিয়ে ইশারা করলেন। চায়ের কাপে চামুচ নাড়ার মত করলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, চা খেয়ে সুবোধ বালকের মত হাজতে ঢুকে পড়বেন। আপনাকে অস্ত্র আইনে গ্রেফতার করা হল।

আমি বললাম, অস্ত্র কোথায়?

ওসি সাহেব বললেন, আমাদের কাছে কিছু অস্ত্র, গুলি, জর্দার কৌটা মজুদ থাকে। যাদের চোখ খারাপ, চোখে শুধু ঘুঘু দেখে ফাঁদ দেখতে পায় না তাদের জন্যে এই ব্যবস্থা। অস্ত্র আইনে গ্রেফতার করে উদ্ধার করা অস্ত্র আলামত হিসাবে জমা দেয়া হয়।

পত্রিকায় ছবিও তো ছেপে দেন।

না, আমরা সব সময় ছবি ছাপি না। কাগজওয়ালাদের ইনভলব করলে সমস্যা বেশি হয়।

ছবিটা ছাপা হলে ভাল লাগতো। আমার স্যুট টাই পরা কোনো ছবি নাই।

ওসি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাব ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে কঠিন কোনো কথা বলতে চান। কথা মাথায় আসছে না।

চা চলে এসেছে। পেনসিলের ইশারা ভাল হয় নি। দুধ চা চেয়েছিলাম এসেছে রং চা। আমি চায়ে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির ভান করে বললাম, ওসি সাহেব একটা ধাঁধার জবাব দিতে পারবেন। জবাব দিতে পারলে পুরস্কার আছে। ধাঁধাটা হল, মুরগির দাঁত কয়টা?

ওসি সাহেব ঘোঁৎ টাইপ শব্দ করলেন। হঠাৎ করেই তাঁর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা আছে। কোন এক সময় পরিষ্কার হবে।

আমি হাজতে আলমের পাশে গিয়ে বসলাম। হতভম্ব আলমকে বললাম, আলামত জমা দিতে গিয়ে ধরা খেয়েছি। অস্ত্র আইনে মামলা হবে। সাত আট বছর জেলের লাপসি খেতে হতে পারে। জেলের বাবুর্চি কেমন কে জানে।

আলম বিড়বিড় করে বলল, কি সর্বনাশ।

আমি বললাম, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা অর্থহীন। পদার্থবিদরা বলা শুরু করেছেন আজ কাল এবং পরশু আসলে একই সময়। নাস্তা কি খাবেন বলুন। আপনার নাস্তার ব্যবস্থা করি। গরম পরোটা কলিজা ভুনা খাবেন? থানার আশে পাশে ভাল রেষ্টুরেন্ট থাকে, হাজতিরা ভাল খেতে পছন্দ করে।

আলম বলল, আপনার সঙ্গে টাকা আছে?

আছে।

এক প্যাকেট সিগারেট আনায়ে দেন। সিগারেটই খাব।

ব্যবস্থা করছি। হাজতে এই প্রথম?

জি।

আনন্দে সময় কাটানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সামনে যে দেয়ালটা দেখছেন মনে করুন এটা একটা ২৯ ইঞ্চি কালার টিভি। টিভিতে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট খেলা দেখাচ্ছে। আরাম করে খেলা দেখুন।

ভাই সাহেব এই সব কি বলেন। আপনার তো মাথায় সমস্যা আছে।

সমস্যা আমাদের সবার মাথায় আছে। যাই হোক দেয়ালে টিভি দেখার চেষ্টা চালিয়ে যান। মনোসংযোগ করুন। আপনি পারবেন। আমি এর মধ্যে নাস্তা আর সিগারেটের ব্যবস্থা করছি।

আলম মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, আজ কাল এবং পরশু আসলে একই সময় ব্যাপারটা বুঝলাম না। যদি বুঝিয়ে বলেন।

আমি বললাম, যারা এই কথা বলছেন তারা নিজেরাও বুঝতে পারছেন না। আমি কি বুঝাব। এই সব উচ্চ চিন্তা বাদ দিয়ে টিভি দেখুন।

হাজতি সব মিলিয়ে আমরা তিন জন। একজন বালক হাজতি, বয়স বার তেরর বেশি হবে না। নাম কাদের।

আমরা তিনজই গভীর আগ্রহে কালিঝুলি মাখা শূন্য দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছি। বালক হাজতির উৎসাহ সবচে বেশি। সে চোখের পলকও ফেলছে না, হা করে তাকিয়ে মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। সেন্ট্রিদের একজন অবাক হয়ে বলল, আপনারা কি দেখেন?

বালক হাজতি বলল, টিভিতে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড খেলা দেখি।

টিভি কৈ?

ঐ তো টিভি। 'ডিসটাব' দিয়েন না তো। ইচ্ছা হইলে খেলা দেখেন।

হাজতিরা টিভিতে খেলা দেখছে এই খবর নিশ্চয় ওসি সাহেবের কাছে পৌছেছে তাকেও একবার দেখলাম পেনসিল হাতে উঁকি দিয়ে যেতে। এই ভদ্রলোক পেনসিল ছাড়া চলতেই পারেন না বলে মনে হচ্ছে। দুর্ধর্ষ আসামী ধরার সময় পিস্তলের মত পেনসিল তাক করেন কি-না কে জানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ডাক পড়ল। ওসি সাহেব খবর দিয়েছেন। আমি বলে পাঠালাম, খেলার মাঝখানে উঠে আসতে পারব না। লাঞ্চব্রেকে আসব। হাই টেনশানের খেলা।

ওসি সাহেব এবং আমি মুখোমুখি বসে আছি।

তিনি যথারীতি হাতের পেনসিল নাচাচ্ছেন। আড়চোখে আমাকে মাঝে মধ্যে দেখছেন। বুঝতে পারছি আমাকে নিয়ে কোনো হিসাব নিকাশ হচ্ছে। কি বলে কথা শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না বলে সময় নিচ্ছেন। আমিই আলোচনা শুরু করলাম। আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, স্যার আপনি কি লক্ষ্য করেছেন পেনসিল সব সময় আটতল বিশিষ্ট হয়। গোল হয় না। কারণটা জানেন?

না।

বলব?

ওসি সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উপেক্ষা করে বললাম, আটতলের কারণে পেনসিল সহজে টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ে না।

আপনার কাছ থেকে বিরাট জ্ঞান লাভ করলাম। আপাতত মুখ বন্ধ করুন। প্রশ্ন করলে জবাব দিবেন।

অবশ্যই জবাব দেব। একটাই অনুরোধ কঠিন প্রশ্ন করবেন না। সায়েন্স বাদ। আমি বিজ্ঞানে দুর্বল। পৃথিবীর ওজন কত জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না। এটম বোমা কে আবিষ্কার করেছেন তাও বলতে পারব না।

শুনলাম হাজতিদের নিয়ে টিভি দেখছিলেন।

ঠিকই শুনেছেন। বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের খেলা। না দেখে পারছি না।

আর যাই করেন পুলিশের সঙ্গে ফাজলামী করবেন না।

পুলিশের সঙ্গে কোনো ফাজলামিতো করছি না। দেয়ালের সঙ্গে করছি।

আমি আপনার বিষয়ে খবর নিয়েছি আপনি অতি ধুরন্ধর একজন মানুষ। ধুরন্ধর কিভাবে টাইট করতে হয় আমি জানি।

জানলে টাইট করে দিন। তবে একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। যে টাইট করে সে একই সময় নিজে লুজ হয়। আপনি আমাকে যতটা টাইট করবেন নিজে ঠিক ততটাই লুজ হবেন। এটা বিজ্ঞানের সূত্র।

বিজ্ঞানের সূত্র? আমাকে বিজ্ঞান সেখান?

আপানাকে কিভাবে বিজ্ঞান শেখাব? আমি আগেই স্বীকার করেছি আমি সায়েন্সে দুর্বল। তবে নিউটনের সূত্রে আছে- To every action there is an equal and opposite reaction. আপনি আমাকে টাইট দিলে নিউটনের

সূত্র অনুসারে আপনাকে লুজ হতে হবে। অর্থাৎ আপনার ব্রেইনের নাট বল্টু লুজ হতে থাকবে। দু'একটা খুলেও পড়ে যাবে। একদিন দেখা যাবে পেনসিল হাতে পথে পথে ঘুরছেন। যাকেই দেখছেন তার সঙ্গেই পেনসিলের ইশারায় কথা বলছেন। সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন, মুরগির কি দাঁত আছে। কেউ আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছে না বলে জবাব দিতে পারছে না।

ওসি সাহেব থমথমে গলায় বললেন, বার বার মুরগির দাঁতের প্রশ্ন আসছে কেন?

এই ধাঁধাটা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাব দিতে পারেন নি বলে আবার মুরগির দাঁত চলে এসেছে।

চা খাবেন?

খাব। দুধ চা, চিনিসহ। দয়া করে পেনসিলে অর্ডার দেবেন না। আপনার পেনসিলের অর্ডার কেউ বুঝতে পারে না।

চা চলে এসেছে। এবার কোনো ভুল হয় নি। চা ঠিক আছে। আলাদা পিরিচে চার পাঁচটা বামুন সিঙ্গাড়া। এক সঙ্গে পাঁচ ছয়টা মুখে দেয়া যায়।

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, আপনাকে কি আমি ছোট্ট একটা গল্প বলতে পারি?

না। চা খান, সিঙ্গাড়া খান। গল্প বলতে হবে না।

হুজুগে বাঙ্গালী নিয়ে একটা রসিকতা করতে চাচ্ছিলাম। এই রসিকতা থেকে বুঝা যাবে আপনি আসল পুলিশ অফিসার না-কি ভেজাল। রসিকতা শুনে আপনি যদি শব্দ করে হাসেন তাহলে আপনি ভেজাল। আসল পুলিশ অফিসার কখনো জোকস শুনে হাসে না।

গল্প বলুন শুনি।

ওসি সাহেব মুখের চামড়া আরো শক্ত করতে চাচ্ছেন। পারছেন না। গল্প শোনার লোভ তাঁর মধ্যে কাজ করছে। হুজুগের এই গল্প আমি অনেকের সঙ্গে করেছি। যারা শুনেছে তারা সবাই হো হো করে হেসেছে। শুধু পুলিশ অফিসাররা কেউ হাসেন নি। আমি গল্প শুরু করলাম।

এক ভদ্রলোক মতিঝিলে কাজ করেন। সত্তুর তলায় তাঁর অফিস। একদিন তিনি মন দিয়ে ফাইল দেখছেন তখন হন্তদন্ত হয়ে তার রুমে পিওন ঢুকে উত্তেজিত গলায় বলল, স্যার খবর শুনেছেন আপনার স্ত্রীতো আপনার গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন!

ভদ্রলোক চূড়ান্ত অপমানিত বোধ করে জানালা খুলে লাফ দিলেন। লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, আরে আমারতো গাড়িই নাই। ড্রাইভারের প্রসঙ্গ আসছে কেন?

কংক্রিটের মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগ মুহূর্তে মনে হল, আরে আমিতো এখনো বিয়েই করি নি।

ওসি সাহেব শব্দ করে হেসে উঠলেন। অনেক কষ্টে হাসি থামালেন।

আমি বললাম, ভাই আপনিতো ভেজাল পুলিশ অফিসার।

ওসি সাহেব বললেন, আমি বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল পাওয়া অফিসার। এখন পর্যন্ত এক টাকা ঘুস খাই নি।

এই জন্যেই তো আপনি ভেজাল।

ওসি সাহেব হাতের পেনসিল নামিয়ে হাই তুলতে তুলতে বললেন, একটা কাগজে আপনার নাম ঠিকানা লিখে চলে যান।

ছেড়ে দিচ্ছেন?

হ্যাঁ ছেড়ে দিচ্ছি।

আমি যাব না।

যাবেন না মানে?

আমার সঙ্গে আরো যে দু'জন আছে তাদেরকে না নিয়ে যাব না। আমি একজন রাশিয়ান পরী বিয়ে করতে যাচ্ছি। আমার লোক বল নাই। এরা থাকলে নানান ভাবে সাহায্য করবে। গায়ে হলুদের ব্যাপার আছে। মেয়ের বাড়িতে মাছ পাঠাতে হবে। বিয়েতে আপনি উপস্থিত থাকলে আমি খুবই খুশি হব স্যার।

ওসি সাহেব হাতের পেনসিল নামিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

সন্ধ্যার দিকে আমরা তিনজনই ছাড়া পেলাম। আলম এবং বালক হাজতি কাদের আমার মেসে থাকতে এল। কাদের ঘোষণা করল সে বাকি জীবন আমার সঙ্গে থাকবে। আমার সেবা করবে। গা হাত পা টিপে দিবে।

আলম এই জাতীয় কোনো কথা বললেন না তবে তিনি জানালেন যে মেস বাড়িতে থাকবেন সেখানে তাঁর মুখ দেখানোর অবস্থা নেই। মেসে অনেক টাকা বাকিও পড়েছে, কাজেই.......

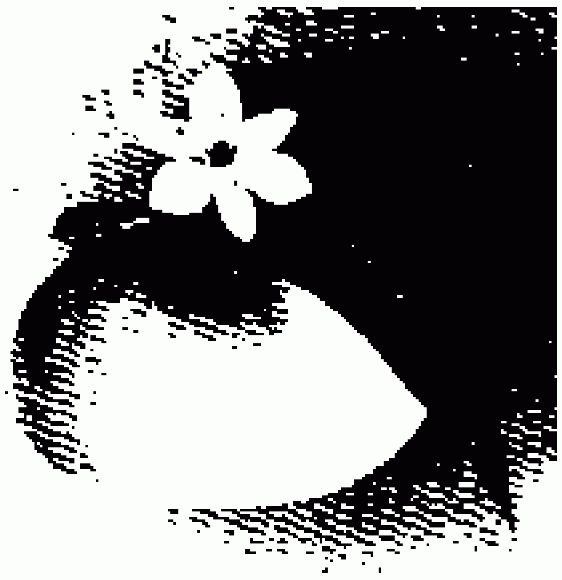

গত সাতদিনে আমার জীবনে যে সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে তা আলাদা শিরোনামে লিখছি। পাঠকদের সুবিধার জন্যে। পাঠকরা যে সব ঘটনা জানতে চান শিরোনাম দেখে তা ঠিক করবেন । ঘটনা প্রবাহ নিম্নরূপ।

রাশিয়ান পরী

তার ঢাকায় আসার সময় হয়ে গেছে। সে আগামী বুধবার সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনসে আসছে। মাজেদা খালাকে সে একটি e-mail পাঠিয়েছে। খালা তার কপি আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এর বাংলা–

আমার খাদ্য ঃ নিরামিশ। মাঝে মধ্যে ডিম চলতে পারে। রাতে ফলাহার করি। একটা আপেল (সবুজ), একটা কলা এবং থাই পেপে। লাঞ্চে আমি এক গ্লাস রেড ওয়াইন খাই (৭৫ ml). ঘুমাতে যাবার আগে ব্ল্যাক কফি।

বাসস্থান ঃ আমি সাধারণ বাংলাদেশী একটি পরিবারের সঙ্গে থাকতে চাই। পেইং গেস্ট হিসেবে থাকব। এটাচড বাথরুম থাকতে হবে। টয়লেট পেপার থাকতে হবে। এই বাথরুম অন্য কেউ ব্যবহার করবে না। টয়লেটে অবশ্যই হট ওয়াটারের ব্যবস্থা থাকবে। দরজা জানালায় নেট থাকবে যাতে মশা মাছি না আসে। বেডশীট এবং টাওয়েল প্রতিদিন সকল দশটার মধ্যে বদলাতে হবে। ঘরে অবশ্যই এসি থাকতে হবে। ইন্টারনেট কানেকশান লাগবে।

যাতায়াত ঃ আমার জন্যে একটা সাইকেল লাগবে। আমি সাইকেলে যাতায়াত করব। যে আমার গাইড তাকেও সাইকেলে সর্বক্ষণ আমাকে অনুসরণ করতে হবে। গাইড প্রতিদিন একশ ডলার করে পাবে। তার খাওয়া-দাওয়া এর মধ্যেই ধরা থাকবে। আমার মেয়ে পরিচয় গাইড নিজে জানবে কিন্তু কাউকে জানাতে পারবে না।

গাইড ঃ গাইডের ইংরেজি ভাষায় দখল থাকতে হবে। আমি বাংলা ভাষা শিখে এসেছি তারপরেও কিছু কথা হয়তোবা আমি বাংলায় প্রকাশ করতে পারব না। গাইডকে বুদ্ধিমান হতে হবে। থার্ডওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে বকর বকর করতে পারাকেই বুদ্ধিমত্তা ধরা হয়। আমার গাইড অতিরিক্ত কথা একেবারেই বলবে না।

আলম এবং বালক হাজতি কাদের

মেসে আমার পাশের ঘরটি তাদের জন্যে ভাড়া নিয়েছি। আলম দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা এই ঘরে থাকেন। ঘর থেকে বের হন না। দাড়ি গোফ কামান না। যে কোনো কারণেই হোক তিনি মহাদুশ্চিন্তায় আছেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষের চুল দাড়ি দ্রুত বাড়ে। তারও বেড়েছে। লম্বা দাড়ি গোফে তার চেহারায় ঋষিভাব চলে এসেছে। তাকে দেখে মনে হয় সারাক্ষণ বিশেষ কিছু নিয়ে ভাবছেন। তিনি কেরোসিন কুকার কিনেছেন। দুইবেলা নিজে রান্না করে নিজের খাবার নিজেই খান। কাদেরকে ভাগ দেন না। এ নিয়ে কাদেরের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আলম যেমন সারাক্ষণ ঘরের ভেতর থাকেন, কাদের থাকে বাইরে। রাতে হঠাৎ হঠাৎ আসে। তাকে দেখে মনে হয় সে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। পরিকল্পনা সে কারো কাছে প্রকাশ করছে না। সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। মাথা নিচু করে মেঝেতে বসে থাকে। আমার চোখের দিকে তাকায় না।

একরাতে আমি নিজ থেকেই বললাম, কিছু বলবি?

হুঁ।

বলে ফেল। পেটে কথা জমিয়ে রাখা ঠিক না। পেটে বেশিদিন গোপন কথা থাকলে এ্যাপেডিসাইটিস ফুলে যায়। ব্যথা শুরু হয়। তখন আর অপারেশন ছাড়া গতি থাকে না।

একটা খুন করতে চাই ভাইজান।

খুন করতে চাইলে কর। এত চিন্তার কি আছে?

কাদের চমকে মাথা তুলে তাকালো। আবার চোখ নামিয়ে ফেলল। সে আমার কথায় পুরোপুরি বিভ্রান্ত।

কারে খুন করতে চাই শুনবেন?

না। যাকে খুন করবি সেতো শেষই হয়ে যাবে। তার কথা শুনে লাভ কি?

খুনের তারিখ ঠিক করেছি। বুধবার দিবাগত রাত।

ঐ তারিখটা বাদ দে। ঐ দিন তোকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাব। পঞ্জিকা দেখে ভাল একটা তারিখ বের করে দিব। ভাল কাজ চিন্তা ভাবনা করে করতে হয় না। মন্দ কাজ অনেক চিন্তা ভাবনা করে করতে হয়।

কাদের বলল, ধরা পড়লে পুলিশ ফাঁসিতে ঝুলাবে না?

তোর বয়স কম ফাঁসিতে ঝুলাবে না। সংশোধন কেন্দ্রে পাঠাবে। সংশোধন কেন্দ্র অপরাধের বিরাট ট্রেনিং সেন্টার। সেখান থেকে ইনশাল্লাহ্ মারাত্মক সন্ত্রাসী হয়ে বের হবি। লোকে তোকে খাতির করবে। টহল পুলিশের সঙ্গে দেখা হলে টহল পুলিশের সালাম পাবি।

ভাইজান আর শুনতে চাই না। চুপ করেন।

আমি চুপ করলাম।

মাজেদা খালা, খালু সাহেব এবং মানিব্যাগ সমাচার

খালু সাহেবের সঙ্গে তাঁর হারানো মানিব্যাগ নিয়ে আমার কথা হয়েছে। মুখোমুখি না, টেলিফোনে।

আমি ঃ খালু সাহেব ভাল আছেন। আপনার প্রেসারের অবস্থা কি?

খালু ঃ আমার প্রেসার নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তোমার নিজের প্রেসার নিয়ে মাথা ঘামাও।

আমি ঃ মানিব্যাগটা কি পাওয়া গেছে?

খালু ঃ হারানো মানিব্যাগ কখনো পাওয়া যায়? খেজুরে আলাপ আমার সঙ্গে করবে না। Stupid.

আমি ঃ খালু সাহেব!
নিজ উদ্যোগে আমি আপনার মানিব্যাগের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি এবং কিছু ফল পেয়েছি।

খালু ঃ কিছু ফল পেয়েছ মানে কি?

আমি ঃ ধোঁয়া বাবা বলেছেন মানিব্যাগ অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিছু টাকা হয়ত পাওয়া যাবে না। বাকি সব পাওয়া যাবে।

খালু ঃ আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছ?

আমি ঃ আমি ইয়ার্কি করব কেন? ধোঁয়া বাবা যা বলছেন তাই বললাম। উনি মানিব্যাগে বাংলাদেশী টাকার পরিমাণ বলতে পারেন নি তবে আমেরিকান ডলারে সাতশ ডলার আছে এটা বলে দিয়েছেন।

খালু ঃ কি বললে?

আমি ঃ জরুরী কিছু কাগজপত্র ক্লিপ দিয়ে আটকানো এটাও বললেন।

খালু ঃ (খানিকটা নরম) ধোঁয়া বাবাটা কে?

আমি ঃ উনি আধ্যাত্মিক মানুষ। বুড়িগঙ্গার ওপাশে থাকেন। কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন না। শুধু ধোঁয়া খান।

খালু ঃ ধোঁয়া খান?

আমি ঃ জি। সিগারেট বা গাঁজার ধোঁয়া না। ভেজা খড় পুরানো ধোঁয়া খেয়ে জীবনধারণ করেন।

খালু ঃ এই সব বুজরুকি আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

আমি ঃ বিশ্বাস করা না করা আপনার ব্যাপার। মানিব্যাগ পাওয়া গেলেই তো হল। তা ছাড়া শেকসপিয়ার বলে গেছেন। "There are many things in heaven and earth." উনার কথাও ফেলে দেয়ার মত না। এত বড় একজন নাট্যকার।

খালু ঃ যারা নিজে stupid তারা অন্যদের stupid ভাবে। তুমি stupid বলেই আমাকে stupid ভাবছ। ধোঁয়া বাবা সম্পর্কে আর কখনোই কিছু বলবে না।

আমি ঃ জি আচ্ছা বলব না। মানিব্যাগ পাওয়া গেলে কি করব?
[খালু সাহেব টেলিফোন রেখে দিলেন]

মাজেদা খালার সঙ্গে আমার রোজই কথা হচ্ছে। তিনি দু'টি বিষয় নিয়ে উত্তেজিত এলিতার ঢাকায় আসা এবং খালু সাহেবের মানিব্যাগে রাখা টেলিফোন নাম্বার।

মাজেদা খালা জানিয়েছেন তিনি টেলিফোন নাম্বার বিষয়ে গোপন অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মোটামুটি নিশ্চিত পরকিয়া জাতীয় কিছু। তিনি জানিয়েছেন সত্যি যদি এমন কিছু হয় তাহলে তিনি খালু সাহেবের মুখে এসিড ছুড়বেন। শুধু পুরুষরাই মেয়েদের মুখে এসিড ছুড়বে তা হবে না। এসিড কিনে দেয়ার দায়িত্ব তিনি আমাকে দিয়েছেন।

আমি দুই লিটারের একটা পানির বোতলে সাদা ভিনিগার ভর্তি করে খালাকে দিয়ে এসেছি। ভিনিগারও এক ধরনের এসিড। খালা ভিনিগার লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর আলমিরাতে। সব এসিড ভয়ংকর না। ভিনিগার এসিড হলেও সুখাদ্য।

পেনসিল ওসি

পেনসিল ওসি সাহেবের আসল নাম আবুল কালাম। তিনি এই নিয়ে তৃতীয় দফা আমার কাছে এসেছেন।

ভদ্রলোক ইংরেজি সাহিত্যে MA. তাঁর গায়ে যখন পুলিশের পোশাক থাকে না তখন তাঁকে অধ্যাপক বলেই মনে হয়।

তিনি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে আসেন এটা পরিষ্কার। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার না। আমার ধারণা আমি পুলিশের নজরদারিতে আছি। পুলিশ মাঝে মাঝে কঠিন অপরাধীদের ছেড়ে দেয়। পেছনে ফেউ লাগিয়ে রাখে। অপরাধী কোথায় যায় কার কাছে যায় এইসব মনিটার করা হয়।

ওসি সাহেবের দেখলাম কাদের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ।

কাদের ছেলেটা কি আপনার সঙ্গেই থাকে?

হ্যাঁ। যাবার জায়গা নাই ।

কাদের আগে কোথায় ছিল জানেন?

না।

জানতে ইচ্ছা হয় না?

না। না-জানাই ভাল। এ জগতে সবচে সুখী হচ্ছে যে কিছুই জানে না যেমন চার বছরের নিচের বয়সের শিশু।

আমি অনেকের কাছে শুনেছি আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। আমার সিগারেটের প্যাকটে কয়টা সিগারেট আছে বলতে পারবেন?

না।

মানিব্যাগে কত টাকা আছে সেটা জানেন?

না।

আপনার বিষয়ে কেন ছড়াল যে আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে?

মানুষ মীথ তৈরি করতে ভালবাসে। আপনি ইংরেজি সাহিত্যের MA আমাকে আপনার পছন্দের একটা ইংরেজি কবিতা শুনান।

কেন?

এমনি। আপনি ঝিম ধরে আছেন। আমিও ঝিম ধরে আছি। ঝিম কাটানোর ব্যবস্থা।

I have been here before,
But when or how I cannot tell,
I know the grass beyond the door,
The sweet heen smell,
The sighing sound, the lights around the shore.

ওসি সাহেব কবিতা শেষ উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, আবার কবে আসবেন?

ওসি সাহেব জবাব দিলেন না। আমি হঠাৎ করে বললাম, পায়ের আলতা খুব সুন্দর জিনিস কিন্তু আলতাকে সব সময় পায়ে পড়ে থাকতে হয় এর উপরে সে উঠতে পারে না।

ওসি সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, হঠাৎ আলতার প্রসঙ্গ তুললেন কেন?

এমনি তুললাম। আলাপ আলোচনার মানুষ প্রায়ই প্রসঙ্গ ছাড়া কথা বলে। ননসেন্স রাইম যেমন আছে, ননসেন্স কথাবার্তাও আছে।

ওসি সাহেব বললেন, আমরা স্ত্রীর নাম আলতা এটা আপনি জানেন?

আগে জানতাম না। এখন জানলাম।

ওসি সাহেব কঠিন চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন। ভদ্রলোক বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছেন। ধাক্কা সামলাতে কিছু সময় লাগবে।

তানিজা এবং তার বাবার জুতা

তানিজাকে তার বাবার জুতা ফিরিয়ে দিয়েছি। বাসায় তখন তানিজা এবং তার কাজের মেয়ে ছাড়া কেউ ছিল না। সদর দরজা তালাবদ্ধ। কথা হল জানালা দিয়ে।

আমি বললাম, তালাবদ্ধ কেন?

তানিজা বলল, মা বাইরে গেছে তো এই জন্যে। তালা খোলা থাকলে অনেক সমস্যা।

সমস্যা বেশি থাকলে তালাবদ্ধ থাকাই ভাল। আমি তোমার বাবার জুতা ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

আপনার রঙ পছন্দ হয় নি? অন্য রঙ দেব?

রঙ ঠিক আছে। ঠিক করেছি জুতা পড়ব না।

চা খাবেন। চা দেব।

দাও এক কাপ চা।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চা খেয়ে চলে এলাম।

এলিতা ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌঁছল ডিসেম্বর মাসের চার তারিখ। বুধবার সময় সকাল ন'টা। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি, জেট লেগ, অপরিচিত নতুন দেশে প্রথম পা দেয়ার শংকায় সে খানিকটা বিপর্যস্ত।

সে ছেলে সেজে আসে নি। মেয়ে সেজেই এসেছে। কালো টপের সঙ্গে লাল, হলুদ, সবুজ রঙের স্কার্ট। রঙগুলি একটির গায়ে একটি মিশে সাইকাডেলিক আবহ তৈরি করেছে। আমার সঙ্গে কাদের। সে বিড় বিড় করে বলল, কেমুন সুন্দর মেয়ে দেখছেন ভাইজান? সাক্ষাৎ হুর।

কাদেরের হাতে প্ল্যাকার্ড ধরা। সেখানে বাংলায় লেখা মি. এলিত। এলিতার আকার বাদ দেয়া হয়েছে নামের মধ্যে পুরুষ ভাব আনার জন্য।

এলিতা এগিয়ে এল।

আমি বললাম, তোমার না পুরুষ সেজে আসার কথা।

এলিতা বলল, পাসপোর্টে লেখা আমি মেয়ে, পুরুষ সেজে আসব কিভাবে?

মাজেদা খালা বলেছিলেন, এলিতা টিচার রেখে বাংলা শিখে এসেছে। তার বাংলার নমুনায় আমি চমৎকৃত। সে বলল, 'আইচা টিক চে'। আমি বললাম, এর মানে কি? এলিতা বলল, এর অর্থ হয় It's ok. তখন বুঝা গেল সে বলছে "আচ্ছা ঠিক আছে'। তার অদ্ভুত বাংলায় আচ্ছা ঠিক আছে হয়ে গেল 'আইচা টিক চে।'

তার আরো কিছু বাংলা,

উষন লগ চে ঃ উষ্ণ লাগছে। অর্থাৎ গরম লাগছে।

খাইদ ভল চে ঃ খাদ্য ভাল লাগছে।

কিনিত বিরাকত ঃ কিঞ্চিৎ বিরক্ত।

পাঠকদের সুবিধার জন্যে তার সঙ্গে কথোপকথন সহজ বাংলায় লেখা হবে। তবে দু'একটা বিশষে ধরনের বাংলা ব্যবহার করা হবে। কাদেরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর এলিতা অবাক হয়ে বলল, "বালকের চশখু পবিত্রতা হয়।" অর্থাৎ এই বালকের চোখের মধ্যে পবিত্রতা আছে।

ইয়েলো ক্যাব নিয়ে আমরা ঢাকার দিকে যাচ্ছি। সে আগ্রহ নিয়ে ঢাকা শহর দেখছে। তার চোখে খানিকটা বিস্ময় বোধ। সে বলল, তোমাদের শহরতো যথেষ্ট পরিষ্কার।

তুমি কি ভেবেছিলে? নোংরা ঘিঞ্জি শহর দেখবে?

হুঁ। আমাকে তাই বলা হয়েছে। রাস্তায় এত দামী দামী গাড়ি দেখেও অবাক হচ্ছি। রিকশা কোথায়? আমি শুনেছি ঢাকা রিকশার শহর। গায়ে গায়ে রিকশা লেগে থাকে। ফুটপাত দিয়ে কেউ হাঁটতে পারে না। রিকশার উপর দিয়ে হাঁটতে হয়।

রিকশা প্রচুর দেখবে। এটা ভিআইপি রোড এই রোডে রিকশা চলাচল করে না।

আমি যে বাড়িতে পেইং গেস্ট থাকব সেখানে কি যাচ্ছি?

মাজেদা খালার বাসায় তোমাকে রাখার প্রাথমিক চিন্তা ছিল। সেটা ঠিক হবে না। তিনি তাঁর স্বামীর গায়ে এসিড ছুড়ে মারার জন্যে আলমারিতে এক বোতল এসিড লুকিয়ে রেখেছেন। এসিড ছোড়াছুড়ির মধ্যে উপস্থিত থাকা কোনো কাজের কথা না।

এসিড ছুড়ে মারা মানে?

এসিড ছুড়ে মুখ ঝলসে দেয়া এ দেশে স্বাভাবিক ব্যাপার। মনে কর কোনো ছেলে কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল। মেয়ে রাজি না হলেই মুখে এসিড।

Oh God.

আমি যদি তোমাকে প্রেমের প্রস্তাব দেই সঙ্গে সঙ্গে না বলবে না। কায়দা করে এড়িয়ে যাবে।

না বললে আমার মুখে এসিড মারবে?

সম্ভাবনা আছে। আমি তো এই দেশেই বাস করি।

লেগপুলিং করবে না। আমি কোথায় থাকব সেই ব্যবস্থা কর।

তোমাকে হোটেলেই থাকতে হবে। পেইং গেস্ট হিসেবে কেউ তোমাকে রাখতে রাজি হবে না।

কেন রাজি হবে না?

রাজি না হবার অনেক কারণ আছে। মূল কারণ একটাই। মূল কারণ কেউ তোমাকে বলবে না। আমি বলে দেই?

দাও।

মূল কারণ হল তুমি পরীর মত রূপবতী একটি মেয়ে। এমন রূপবতী একজনকে কোনো গৃহকর্ত্রী বাড়িতে জায়গা দেবে না। তাদের স্বামী তোমার প্রেমে পড়ে যেতে পারে এই আশংকায়।

এলিতা শব্দ করে হাসছে। তার হাসি দেখতে এবং হাসির শব্দ শুনতে ভাল লাগছে। বাংলাদেশের কিশোরীরা শব্দ করে হাসে। একটু বয়স হলেই হাসির শব্দ গিলে ফেলে হাসার চেষ্টা করে। চেষ্টাতে সাফল্য আসে। এক সময় হাসির শব্দ পুরোপুরি গিলে ফেলতে শিখে যায়। হারিয়ে ফেলে চমৎকার একটি জিনিস।

এলিতা বলল, প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমিয়ে পর। যথাসময়ে জাগিয়ে দিব।

একবার ঘুমিয়ে পড়লে কেউ আমাকে জাগাতে পারে না।

চিন্তা নেই, ঘুমন্ত অবস্থাতেই ধরাধরি করে তোমাকে হোটেলের রুমে নিয়ে তুলব।

তুমি যে বাড়িতে থাক সেখানে আমাকে নিয়ে যাও।

আমি কোনো বাড়িতে থাকি না। মেসে থাকি। সেখানে তোমাকে নেয়া যাবে না।

কেন?

মেস হচ্ছে পায়রার খুপড়ির মত ছোট ছোট কিছু রুম। সেই সব রুমে আলো বাতাস ঢোকা নিষিদ্ধ। কমন বাথরুম। বাথরুম ব্যবহার করতে হলে লাইনে দাঁড়াতে হয়। মেসের মালিক মশা, মাছি, তেলাপোকা এইসব পুষেন।

বল কি। কেন পুষেন?

যারা মেসে থাকে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করার জন্যে পুষেন।

তুমি ঠাট্টা করছ?

না।

আমি প্রথম তোমার মেসে যাব তারপর অবস্থা দেখে ডিসিসান নেব।

তা করতে পার।

আমি এখন ঘুমিয়ে পড়ব।

এমনি এমনি ঘুমিয়ে পড়বে? না-কি আমাকে ঘুম পাড়ানি গান গাইতে হবে?

তুমি ঘুমপাড়ানি গান জান?

জানি। তবে আমাদের দেশে পুরুষদের ঘুম পাড়ানি গান গাওয়া নিষিদ্ধ। ঘুম পাড়ানি গান শুধু মা গাইবেন।

আশ্চর্য তো।

আশ্চর্যের সবে শুরু। তুমি আরো অনেক আশ্চর্যের সন্ধান পাবে।

প্লীজ একটা ঘুম পাড়ানি গান গাও।

আমি গাইলাম,

খুকু ঘুমালো
পাড়া জুড়ালো
বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

এলিতা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তুর্গেনিভের এক উপন্যাস পড়েছিলাম, "যে নারীকে ঘুমন্ত অবস্থাতে সুন্দর দেখায় সেই প্রকৃত রূপবতী।" এলিতাকে প্রকৃত রূপবতী বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইয়েলো ক্যাবে উপস্থিত থাকলে বিড় বিড় করে বলতেন–

দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্গেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা লাবণ্যে নিরালা।

পকেটে মোবাইল বাজছে। মাজেদা খালা ধার হিসেবে আমাকে এই মোবাইল দিয়েছেন। যত দিন এলিতা বাংলাদেশে থাকবে ততদিন মোবাইল আমার সঙ্গে থাকবে যাতে আমি সব সময় খালার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি।

হিমু এলিতা কি এসেছে?

হুঁ।

তার অবস্থা কি?

সে গোঁফ কামিয়ে মেয়ে হয়ে গেছে।

ফোনটা এলিতার কাছে দে কথা বলি। তোকে কিছু জিজ্ঞেস করা অর্থহীন।

এলিতা ঘুমাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে তাকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। এখন সে আছে গভীর ঘুমে। এই মুহূর্তে স্বপ্ন দেখছে।

বুঝলি কি করে স্বপ্ন দেখছে?

REM হচ্ছে। তাই দেখে বুঝছি?

REM আবার কি?

Rapid eye movement. চোখের পাতা দ্রুত কাঁপছে। সুন্দর কোনো স্বপ্ন দেখার সময় এই ঘটনা ঘটে। যখন ভয়ংকর স্বপ্ন কেউ দেখে তখন চোখের পাতার সঙ্গে ঠোঁটও কাঁপে।

আমার সঙ্গে চালবাজি করবি না।

আচ্ছা যাও করব না।

এলিতা উঠবে কোথায়?

এখনো বুঝতে পারছি না ঘুম ভাঙ্গুক তারপর ডিসিসান হবে।

ও তোর ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে না কি?

না।

এক কাজ কর আস্তে করে মেয়েটার মাথা তোর কাঁধে এনে ফেল। ও যেন বুঝতে না পারে।

লাভ কি?

ঘুম ভেঙ্গে এলিতা দেখবে তোর ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে তাতে লজ্জা পাবে। লজ্জা থেকে প্রেম।

লজ্জা থেকে প্রেম হয় এটা জানা ছিল না।

খালা বললেন, রাগ থেকে প্রেম হয়, ঘৃণা থেকে প্রেম হয়, অপমান থেকে প্রেম হয়, লজ্জা থেকে হয়।

আমি বললাম, তোমার কথায় মনে হচ্ছে সব কিছু থেকে প্রেম হয়। হয় না কি থেকে সেটা বল।

তুইতো বিপদে ফেললি।

খালা সুসংবাদ আছে এলিতা নিজে থেকেই আমার ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে।

ভেরি গুড। একটা ছবি তুলতে পারবি?

ছবি কিভাবে তুলব?

তোকে যে মোবাইলটা ধার দিয়েছি সেখানে ছবি তোলার অপসান আছে। অপসানে যা। এক হাতে মোবাইলটা তোদের দু'জনের মুখের কাছে এনে বাটনে টিপ দে।

আমি ছবি তুললাম না। এলিতার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় থাকলাম।

এলিতা এখনো ঘুমুচ্ছে। মেসে আমার বিছানায় বাচ্চাদের মত কুকড়িমুকড়ি ঘুম। এই ঘরে দিনের বেলাতেও কিছু ড্রাকুলা মশাকে দেখা যায়। ড্রাকুলা মশাদের বিশেষত্ব হচ্ছে এরা কানের কাছে ভনভন করে না। সরাসরি রক্তপান। ধর তক্তা মার পেরেক টাইপ। ড্রাকুলা মশাদের হাত থেকে এলিতাকে বাঁচানোর জন্যে তার বিছানায় আলম মশারি খাটিয়ে দিয়েছেন।

ঘুম ভাঙ্গলেই এলিতার ক্ষিধে পাবে। সেই ব্যবস্থাও আলম করে রেখেছেন। গফরগায়ের গোল বেগুনের চাক্তি হলুদ লবণ মাখিয়ে রাখা হয়েছে। নতুন আলু কুচি কুচি করে লবণ পানিতে ভেজানো। দেশি মুরগির ডিমে সামান্য দুধ দিয়ে প্রবলভাবে ফেটানো হয়েছে। কালিজিরা চাল এনে রাখা হয়েছে। দশ মিনিটের নোটিসে খাবার দেয়া হবে।

আমি আলমের ঘরে বসে আছি। বালক হাজতি কাদের নেই। কোথায় গেছে কখন ফিরবে কিছুই বলে যায় নি।

আলম বলল, হিমু ভাই আমি চিন্তা করে একটা বিষয় পেয়েছি।

কি পেয়েছেন?

একটা রহস্যের সমাধান পেয়েছি।

এখন বলা যাবে না। অন্য কোনো সময় বলব।

আপনার যখন বলতে ইচ্ছা করবে, বলবেন।

আমি যে দিনরাত দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকি, খামাখা বসে থাকি না। চিন্তা করি।

এখন কি নিয়ে চিন্তা করছেন?

আজ কোনো চিন্তা শুরু করতে পারি নাই। গতকাল চিন্তা করেছি মশা নিয়ে।

মশা নিয়ে কি চিন্তা?

দুপুরবেলা মশা গালে কামড় দিয়েছে। গাল ফুলে গেছে তখন শুরু করলাম মশা নিয়ে চিন্তা। মানুষের যেমন শেষ বিচারের দিনে হিসাব নেয়া হবে মশারও কি হবে? আমাদের যেমন দোজখ বেহেশত আছে মশাদের কি আছে? দুষ্ট মশাদের আল্লাহপাক কি দোজখের আগুনে পুড়াবেন?

আপনার কি মনে হয়?

আমার মনে হয় পুড়াবেন না। অতি তুচ্ছ মশা মাছিকে শাস্তি দেয়ার কিছু নাই।

আমি বললাম, আল্লাহর কাছে মানুষতো মশা মাছির মতই তুচ্ছ। মানুষকে তিনি কেন শাস্তি দিবেন?

আলম গম্ভীর হয়ে বলল, এটাও একটা বিবেচনার কথা। এটা নিয়ে আলাদা ভাবে চিন্তা করতে হবে।

এলিতার ঘুম ভাঙ্গল রাত আটটা বাজার কিছু আগে। লোডশেডিং হচ্ছে বলে বাতি জ্বলছে না। টেবিলের উপর দু'টা মোমবাতি জ্বলছে। মশারির ভেতর এলিতা অবাক হয়ে বসে আছে। ঘরে আলো আধারের খেলা। এলিতা বিস্মিত গলায় বলল, আমি কোথায়?

আমি বললাম, তুমি আমাদের মেস বাড়ির একটা ঘরে।

আমার মাথার উপরে জালের মত এই তাবুটা কি?

একে বলে মশারি। ঘুমের মধ্যে যেন মশা বা মাছি তোমাকে বিরক্ত না করে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আমি ভেবেছিলাম মারা গেছি। মৃত্যুর পর আমার আত্মাকে আটকে রাখা হয়েছে। কি যে ভয় পেয়েছিলাম।

ভয় কেটেছে?

হ্যাঁ। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

দশ মিনিটের মধ্যে তোমার খাবার ব্যবস্থা হবে। আজ আমরা যা দিব তাই খাবে। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেব। এখানকার টয়লেটগুলির অবস্থা খুবই খারাপ তারপরেও একটা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

এলিতা বলল, আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার ভয় কেটেছে আসলে কাটে নি আমার এখনো মনে হচ্ছে আমি মৃত আমার 'soul' তোমার সঙ্গে ঘুরছে।

আমি বললাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি আলো ঝলমল ফাইভস্টার হোটেলে যাবে তখন আর নিজেকে মৃত মনে হবে না।

খেতে বসে এলিতা বলল, কাঁটাচামচ কোথায়? আমিতো হাত দিয়ে খেতে পারি না।

আমি বললাম, বাংলাদেশের খাবার হাত দিয়ে স্পর্শ করে তারপর মুখে দিতে হয়। এটাই নিয়ম। একবেলা আমাদের মত খেয়ে দেখ।

এলিতা খাওয়া শেষ করল গম্ভীর মুখে। খাবার তার পছন্দ হচ্ছে কি না তা তার মুখ দেখে বুঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ভুরু কুচকাচ্ছে তা দেখে মনে হয় খাবার ভাল লাগছে না।

এলিতা খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আমি আমার জীবনে ভাল যত খাবার খেয়েছি আজকেরটা তার মধ্যে আছে। আমি 'Food' শিরোনামে যে সব ছবি তুলব সেখানে এই খাবারের ছবিও থাকবে। গরম ভাত

থেকে ধোঁয়া উড়ছে। গরম ভাত একজন হাত দিয়ে স্পর্শ করছে। আজকের খাবারের শেফ কে?

আমি আলমকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এলিতা অবাক হয়ে বলল, আপনার চোখে পানি কেন?

আলম বলল, সামান্য খানা বিষয়ে এত ভাল কথা বলেছেন এই জন্যে চোখে পানি এসেছে। সিস্টার আমি ক্ষমা চাই।

এলিতা বলল, আপনার চোখের পানি দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছি। আপনি কি ফুল টাইম শেফ? কোন রেষ্টুরেন্টে কাজ করেন?

আলমের চোখে পানির পরিমাণ আরো বাড়ল। তার চরিত্রে যে এমন স্যাঁত স্যাঁতে ব্যাপার আছে তা এই প্রথম জানলাম। আমি এলিতাকে বললাম, আলম কোনো প্রফেশনাল কুক না। তিনি নিজের খাবার নিজে রেধে খান। দরজা জানালা বন্ধ করে দিন রাত চিন্তা করেন।

এলিতা বিস্মিত গলায় বলল, কি চিন্তা করেন?

জটিল সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে যেমন– গতকাল চিন্তা করছেন মশাদের soul আছে কি-না তা নিয়ে–

বল কি?

তোমার যদি চিন্তার কোনো সাবজেক্ট থাকে আলমকে বললেই তিনি চিন্তা শুরু করে দেবেন।

চিন্তার জন্যে তিনি কি কোন ফিস নেন?

না।

আমরা এলিতাকে সোনারগাঁ হোটেলে নামিয়ে দিয়ে এলাম। আলম বললেন, সিস্টার যাই? এই দু'টি শব্দ বলতে গিয়ে তার গলা ভেঙ্গে গেল এবং চোখ ছলছল করতে লাগল। এলিতা অবাক হয়ে বলল Oh God! what a strange man.

এলিতা তার প্রথম ছবির সন্ধানে বের হবে। বাহন হিসেবে সে সাইকেল চেয়েছিল। সাইকেলের বদলে রিকশার ব্যবস্থা হয়েছে। রিকশা এলিতার পছন্দ হয়েছে। এলিতার পেছনে পেছনে আমার থাকার কথা, আমি আরেকটা রিকশা নিয়েছি। আমাদের সঙ্গে একটা ভ্যানগাড়িও আছে। সেখানে আলম এবং কাদের বসে আছে। তাদের সঙ্গে নানান ধরনের রিফ্লেকটর, সান গান। ছবি তুলতে এত কিছু লাগে জানতাম না।

এলিতা বলল, আমরা দু'জনতো এক রিকশাতেই যেতে পারি।

আমি বললাম, তা সম্ভব না।

সম্ভব না কেন?

গায়ের সঙ্গে গা লেগে যেতে পারে।

তাতে অসুবিধা কি?

আমি বললাম, গায়ের সঙ্গে গা লাগলে তোমার শরীরের ইলেকট্রন আমার শরীরে ঢুকবে। আমার কিছু ইলেকট্রন যাবে তোমার শরীরে। দু'জনের মধ্যে বন্ধন তৈরি হবে। এটা ঠিক হবে না।

এলিতা বিরক্ত গলায় বলল, এমন উদ্ভট কথা আমি আগে শুনি নি। আমি অনেকের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে বাসে ট্রেনে ঘুরেছি। কারো সঙ্গেই আমার কোনো বন্ধন তৈরি হয় নি।

আমি বললাম, কেন হয় নি বুঝতে পারছি না। বন্ধন হবার কথা। একজন সাধুর সঙ্গে তুমি যদি কিছুদিন থাক তোমার মধ্যে সাধু স্বভাব চলে আসবে। দুষ্ট লোকের সঙ্গে কিছুদিন থাক তোমার মধ্যে ঢুকবে দুষ্ট স্বভাব।

বক্তৃতা বন্ধ কর। বেশি কথা বলা মানুষ আমি পছন্দ করি না।

আমি বললাম, হুট করে মাঝখান থেকে বক্তৃতা বন্ধ করা যায় না। শেষটা শোন। আমাদের কালচার বলে পাশাপাশি সাত পা হাঁটলে বন্ধুত্ব হয়। তুমি ছবি তুলতে এসেছ, দেশের কালচার মাথায় রেখে ছবি তুলবে। এখন বল কিসের ছবি তুলবে?

ডাস্টবিনের ছবি। ডাস্টবিনে মানুষ খাদ্য অনুসন্ধান করছে এরকম ছবি।

এই ছবি তুলতে পারবে না।

কেন পারব না? তোমাদের দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে এই জন্যে পারব না?

আমি বললাম, এলিতা শোন। দেশের ভাবমূর্তি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। এই ছবি তুলতে পারবে না কারণ ডাস্টবিনে এখন কেউ খাদ্য খুঁজে না।

এলিতা বলল, তুমি স্বীকার করতে চাইছ না কিন্তু আমি জানি তোমাদের দেশে ডাস্টবিনে খাবার খোঁজা হয়। আমি ভিডিও ফুটেজ দেখেছি।

বানানো ফুটেজ দেখেছ। আমাদের দারিদ্র্য দেখতে তোমাদের ভাল লাগে বলেই নকল ছবি তোলা হয়। আমি তোমাকে ঢাকা শহরের প্রতিটি ডাস্টবিনে নিয়ে যাব। যদি এরকম দৃশ্য পাও অবশ্যই ছবি তুলবে।

এলিতা বলল, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?

আমি বললাম, আমি মোটেও রেগে যাচ্ছি না। তুমি চাইলে ডাস্টবিনে খাবার খুঁজছে এমন কিছু নকল ছবি তোলার ব্যবস্থা করা যাবে। কয়েকজন টোকাইকে বললেই এরা খাবার খোঁজার চমৎকার অভিনয় করবে। টোকাইরা ভাল অভিনয় জানে। বাংলাদেশে টোকাই নাট্য দল পর্যন্ত আছে।

টোকাই কি?

যারা ফেলে দেয়া জিনিসপত্র খুঁজে বেড়ায় এরাই টোকাই।

এলিতা বলল টোকাই লাগবে না। আমি টোকাই ছাড়াই ছবি তুলব। মিথ্যা ছবি আমি তুলি না।

ঢাকা শহরের ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে বিকাল পর্যন্ত ঘুরলাম। কোথাও খাবারের সন্ধানে কাউকে ঘুরতে দেখা গেল না। এক জায়গায় একটা বালিকাকে পাওয়া গেল সে নাকে জামা চাপা দিয়ে কাঠি দিয়ে ময়লা ঘাঁটাঘাটি করছে। সে জানালো ডাস্টবিনে মাঝে মাঝে দামী জিনিস পাওয়া যায়। সে নিজে একবার

একটা মোবাইল ফোন পেয়েছিল। একশ টাকায় একজনের কাছে বিক্রি করেছে।

খাবারের ছবি একটা শেষ পর্যন্ত তোলা হল। ফুটপাতে পা নামিয়ে খালি গায়ে এক বৃদ্ধ ললিপাপ আইসক্রিম খাচ্ছে। বৃদ্ধের মাথার চুলদাড়ি ধবধবে সাদা। তার হাতের আইসক্রিমের রঙ টকটকে লাল। সাদা এবং লালের কন্ট্রাস্টে সুন্দর দেখাচ্ছে।

এলিতা বলল, খুব সুন্দর ন্যাচারাল আলো পেয়েছি। ছবিটা ভাল হবে।

আমি বললাম, এই আলোর আমাদের দেশে একটা নাম আছে। একে বলে কন্যা সুন্দর আলো। এই আলোর বিশেষত্ব হচ্ছে কালো মেয়েদের এই আলোয় ফর্সা লাগে।

তোমার দেশে ফর্সা লাগাটা খুব জরুরি?

হ্যাঁ। আমরাও তোমাদের মত।

আমাদের মত মানে?

তোমাদের দেশে তামাটে গায়ের রঙ হওয়া খুবই জরুরি। অনেক ডলার খরচ করে রোদে পুড়ে তোমরা গায়ের রঙ বদলাও। আমরা শুধু বিশেষ এক সময়ের আলো গায়ে মেখে ফর্সা হয়ে যাই। এ জন্যে আমাদের টাকা পয়সা খরচ করতে হয় না।

এলিতা বলল, তুমি কি প্রমাণ করার চেষ্টা করছ যে তোমরা শ্রেষ্ঠ?

কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করছি না।

এলিতা বলল, এই বৃদ্ধ খালি গায়ে বসে আছে। তাকে জিজ্ঞেস কর আমি যদি তাকে একটা সার্ট বা স্যুয়েটার কিনে দেই সে কি নেবে?

তুমি সার্ট বা স্যুয়েটার উপহার হিসেবে দেবে, না-কি ভিক্ষা হিসেবে দেবে? উপহার হিসেবে দিলে তাকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করে উপহার দেই না।

এলিতা বলল, তুমি বাজে তর্ক করতে পছন্দ কর। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর বের হব না।

আমি কি চলে যাব?

হ্যাঁ।

আমি বললাম, আলম আর কাদের থাকুক। ওরাতো আর কথা বলে তোমাকে বিরক্ত করছে না। দু'জনই মুগ্ধ হয়ে তামার কর্মকাণ্ড দেখছে।

ওরা থাকুক।

আমার আজকের দিনের পেমেন্টটা আলমের হাতে দিয়ে দিও।

আমি রিকশা থেকে নেমে হেঁটে রওনা দিলাম। ইচ্ছা করছে মাথা ঘুরিয়ে এলিতার মুখের ভাব দেখি। কাজটা করা গেল না কারণ আমার মহান পিতা এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করে গেছেন– তার বাণী সমগ্রের একটির শিরোনাম বিদায়। তিনি লিখেছেন–

বিদায়

পুত্র হিমু। তুমি যখন কারো কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করবে তখন পেছনে ফিরে তাকাবে না। পেছন ফিরে তাকানো অর্থ মায়া নামক ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেয়া। তুমি তা করতে পার না। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ কখনো কারো কাছ থেকে বিদায় নেয় না। তখন মায়া নামক ভ্রান্তি তাকে ত্যাগ করে। ভয় নামক অনুভূতি গ্রাস করে। সে পৃথিবী ছেড়ে যেতে চায় না। মহাপুরুষরাই শুধু মৃত্যুর সময় উপস্থিত সবার কাছ থেকে বিদায় নেন।

সন্ধ্যাবেলা আলম এবং কাদের বিমর্ষ মুখে ফিরে এল। তারা আমার জন্যে খামে ভর্তি করে একশ ডলারের একটা নোট এনেছে। তার সঙ্গে এলিতার লেখা চিঠি। চিঠি ইংরেজিতে লেখা, Dear Himu দিয়ে শুরু করা হলেও Dear শব্দটি কেটে দেয়া হয়েছে। চিঠির বঙ্গানুবাদ–

হিমু,

তোমার প্রাপ্য ডলার পাঠানো হয়েছে। তোমাকে কিছু কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। তুমি বুদ্ধিহীন একজন মানুষ। বুদ্ধিহীনরাই তর্কবাজ হয়। বুদ্ধির অভাব তর্ক দিয়ে ঢাকতে চায়।

তুমি নানান বিষয়ে আমাকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছ। বিষয়টা অত্যন্ত বিরক্তিকর। আমি তোমার দেশে শিক্ষা সফরে আসি নি। নিজের কাজ নিয়ে এসেছি।

তোমাকে কঠিন কঠিন কথা লিখলাম। তার জন্যে আমি যে খারাপ বোধ করছি– তা-না। তোমার সার্ভিসের আমার আর প্রয়োজন নেই।

তবে মি. আলম এবং কাদেরকে আমার প্রয়োজন। ওরা নিয়মিত আসবে। আলোচনা সাপেক্ষে তাদের পেমেন্ট ঠিক করা হবে।

এলিতা

আমার বেকার জীবনের শুরু, আলম এবং কাদেরের কর্মময় সময়ের শুরু। এরা দু'জন ভোরবেলা ভ্যান নিয়ে চলে যায়, সন্ধ্যাবেলা ফিরে। এদের কাছ থেকে নানান ধরনের ছবি তোলার গল্প শুনি। কয়েকটি উল্লেখ করা যায়। ফটোগ্রাফের নামগুলি আমার দেয়া। এলিতা নিশ্চয়ই ইংরেজিতে সুন্দর নাম দেবে।

কুকুর এবং ইলিশ

এই ফটোগ্রাফটা কাওরান বাজার মাছের আড়তে তোলা। একজন ইলিশ মাছের ঝাঁকা নিয়ে বসেছে। কুচকুচে কালো এক কুকুর এসে ইলিশ মাছ মুখে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। কুকুরের পেছনে দুনিয়ার ছেলেপুলে। কুকুর ইলিশ মাছ মুখে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। রাস্তার দু'পাশের গাড়ি থেমে আছে। ফটোগ্রাফটা এই সময়ে তোলা। কুকুর ইলিশ মাছ মুখে নিয়ে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। তাকে নিয়ে এত হৈ চৈ কেন হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না।

পিতা পুত্র এবং সাগর কলা

এই ফটোগ্রাফটা সোহারওয়ার্দি উদ্যানের বেঞ্চে তোলা। পিতা এবং পুত্র বসে আছে। বাবার হাতে একটা সাগর কলা, ছেলের হাতে একটা সাগর কলা। বাবা তার হাতের কলা ছেলেকে খাওয়াচ্ছে। ছেলে তার হাতের কলা বাবাকে খাওয়াচ্ছে।

ইটালিয়ান হোটেলের রুটি

রাস্তার পাশে ইটবিছানো খাবারের দোকান। অতি বৃদ্ধ একজন রুটি খাচ্ছে। তার হাতে কাচা মরিচ। সে কাচা মরিচের দিকে তাকিয়ে রুটি খাচ্ছে।

কসাই এর চা পান বিরতি

ফটোগ্রাফটা নিউমার্কেটের কসাই এর-দোকানে তোলা। গরুর বড় বড় রান ঝুলছে। রানের ফাঁকে কসাইকে দেখা যাচ্ছে। তার হাতে গ্লাসভর্তি চা। একটা

গরুর কাটা মাথা কসাইয়ের পাশে রাখা। মনে হচ্ছে গরুর মাথা অবাক হয়ে কসাইয়ের চা পান দৃশ্য দেখছে।

এলিতা আমাকে বিদায় করে দিয়েছে, কাজেই মাজেদা খালার মোবাইল ফেরত দিয়ে আসতে হবে। আমি মোবাইল ফেরত দিতে গেলাম। খালু সাহেবের মানিব্যাগ সঙ্গে নিলাম। কিছু টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম এলিতার ডলার ভেঙ্গে টাকা করে নিলাম, তারপরেও পঞ্চাশ টাকা কম হল।

মাজেদা খালা আমাকে দেখেই তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এলিতা মেয়েটা কত অভদ্র তুই জানিস?

নাতো।

ওকে কয়েকবার টেলিফোন করেছি বাসায় লাঞ্চ করতে বলেছি সে আসে নি। টেলিফোন করি, মিসকল হয়ে থাকে এই মেয়ে কল রিটার্ন করে না। তার জন্যে সব কিছু করে দিলাম আমি এখন কি-না আমাকেই চিনে না। নিজেকে সে কি ভাবে? রূপবতী মেয়ে হয়ে আমার মাথা কিনে নিয়েছে? আমার মাথা এত সস্তা না। এখন বল তোর সঙ্গে তার ব্যবহার কেমন। অভদ্র মেয়ের গাইড হবার দরকার নেই। তুই চাকরি ছেড়ে দে।

খালা থামতেই আমি বললাম, চাকরি ছাড়ার উপায় নেই খালা। এলিতা আমার চাকরি নট করে দিয়েছে। চার দিন হল পথে পথে বেকার ঘুরছি।

বলিস কি?

বিয়েটা মনে হয় হল না।

এই নিয়ে তুই ভাবিস না। রূপ দিয়ে কিছু হয় না। মেয়েদের রূপ আর পদ্মপাতার জল একই। মন খারাপ করিস না।

আচ্ছা করব না। খালু সাহেবের টেলিফোনের ব্যাপারটা কিছু হয়েছে?

আমার ধারণা ধরে ফেলেছি। লোক লাগিয়েছি সে পাত্তা লাগচ্ছে। আমার কাছে বাহাত্তুর ঘন্টা সময় চেয়েছিল। আগামীকাল বাহাত্তুর ঘন্টা পার হবে।

এসিড কবে ঢালবে?

বুঝতে পারছি না।

তাড়াহুড়া করবে না। তাড়াহুড়ার ব্যাপার না। এসিড ঠিকমত ঢালতে হবে। বেঁচে থাকলেও চোখ যেন যায়।

মাজেদা খালা হতভম্ব গলায় বললেন, এইসব কি ধরনের কথা।

আমি বললাম, তুমি মুখে এসিড ঢালবে সব ঠিক থাকবে তাও তো হবে না।

মাজেদা খালা বললেন, তুই একটা ক্রিমিন্যাল। তুই আর এই বাড়িতে আসবি না।

খালু সাহেবের পরকিয়া প্রেমের কি হবে? এতবড় একটা অন্যায় চোখ বুজে সহ্য করবে?

একটা কেন দশটা পরকিয়া করুক তার জন্যে আমি চোখ গেলে দিব? তুই আমাকে ভাবিস কি? তোর এসিডের বোতল নিয়ে এক্ষুনি বিদায় হ।

আর এ বাসায় আসব না?

অবশ্যই না।

খালু সাহেবের সঙ্গে শেষ দেখা করে যাই।

খালু সাহেব শোবার ঘরে আধশোয়া হয়ে ন্যাশানাল জিওগ্রাফি পড়ছেন। টিভি চলছে, টিভিতেও ন্যাশানাল জিওগ্রাফি। ডাবল একশান।

আমাকে ঢুকতে দেখে খালু সাহেব মহা বিরক্ত গলায় বললেন, হুট করে ঘরে ঢুকে পড়লে? সামান্য ভদ্রতার ধারও ধার না। ব্যক্তিগত শোবার ঘরতো গণ বৈঠকখানা না। ইচ্ছা হল, ঢুকে পড়লে।

আমি বললাম, ধোঁয়া বাবার কাছে গিয়েছিলাম উনি মানিব্যাগ উদ্ধার করেছেন। মানিব্যাগ নিয়ে এসেছি। সব ঠিকঠাক আছে কি-না দেখে নিন।

হতভম্ব খালু সাহেব মানিব্যাগ হাতে নিলেন। উল্টে পাল্টে দেখলেন। চোখ ছানা বড়া হওয়া বলে একটা কথা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত আছে। খালু সাহেবের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তবে বেশ বড় সাইজের ছানাবড়া। আমি বললাম, ধোঁয়া বাবা আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

কেন?

মানিব্যাগ থেকে উনি পঞ্চাশটা টাকা রেখে দিয়েছেন। খড় কিনবেন। খড়ে পানি দিয়ে ভেজানো হবে। সেই ভেজা খড় জ্বালানো হবে। এতে প্রচুর ধোঁয়া হয়। খালু সাহেব! যাই ভাল থাকবেন। আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দেখা হবে না কেন?

মাজেদা খালা আমাকে এ বাড়িতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন।

আমি চলে এলাম। খালু সাহেব তাকিয়ে রইলেন তাঁর মানিব্যাগের দিকে।

মেসে ফিরে দেখি আমার ঘরের সামনে টুলের উপর পেনসিল ওসি বসা। তাঁর মুখ গম্ভীর হাতে পেনসিলের বদলে ফ্লাস্ক।

আমি বললাম, বাইরে বসে আছেন কেন? আমার ঘরের দরজা খোলা। ঘরে বসে অপেক্ষা করলেই হত। কোনো কাজে এসেছেন না-কি সামাজিক সৌজন্য সাক্ষাৎ? আসুন ঘরে গিয়ে বসি।

ওসি সাহেব ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের উপর চায়ের ফ্লাস্ক রাখতে রাখতে বললেন, দু'টা কাপের ব্যবস্থা করুন। ফ্লাস্কে চা নিয়ে এসেছি।

ট্যাবলেট সিঙ্গাড়া আনেন নি?

না। পরের বার আসব। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সত্য জবাব দেবেন। কাদের কোথায়?

সে আছে এলিতার সঙ্গে। এলিতাকে ছবি তুতে সাহায্য করছে। এলিতা হল.....

এলিতার বিষয়টা জানি। সে বাংলাদেশে কেন এসেছে তাও জানি। আমি কাদেরের বিষয়ে জানতে চাচ্ছি।

সে আমাকে জানিয়েছে সে ঠিক করেছে একটা খুন করবে। দিন তারিখ আমার ঠিক করে দেয়ার কথা। পঞ্জিকা দেখে ভাল দিন বের করব। পঞ্জিকা কেনা হয় নি।

পঞ্জিকার জন্যে খুন আটকে আছে?

আমি বললাম, শুধু পঞ্জিকা না। শাহরুখ খানের জন্যেও আটকা আছে।

সে কে?

বলিউডের কিং খানকে চেনেন না? আপনারতো চাকরি যাবার কথা। কাদের আমি স্টেডিয়ামে কিং খানের খেলা দেখার পর খুনটা করবে। তিন হাজার টাকার টিকিট কাটবে। তার হাতে এখন টাকা আছে। এলিতা প্রতিদিন তাকে বিশ ডলার করে দিচ্ছে।

আমি দু'টা গ্লাসের ব্যবস্থা করলাম। গ্লাস ভর্তি চা নিয়ে দু'জন মুখোমুখি বসেছি। ওসি সাহেবের মুখ আরো অন্ধকার হয়েছে। আমি বললাম, আলতা ভাবি কেমন আছেন।

ওসি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তার বিষয়ে কথা বলার জন্যে আমি আপনার এখানে আসিনি। আমি এসেছি কাদেরকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবার জন্যে। ওকে টোপ হিসেবে বাইরে ছেড়ে রাখা হয়েছে। আমাদের ইনফরমেশন যা জোগাড় করার করেছি। এখন তাকে আটক করা যায়।

আমি বললম, এতদিন যখন অপেক্ষা করেছেন আরো কয়েকটা দিন করুন। কিং খানের খেলাটা হয়ে যাক।

উনি কি খেলা দেখাবেন?

আমি জানি না কি খেলা দেখাবেন। নিশ্চয়ই ভাল কোনো খেলা। বাংলাদেশের মানুষ আধাপাগল হয়ে গেছে। আমি ভাবছি মিস এলিতাকেও খেলাটা দেখাব। উনি রাজি হলে হয়।

চা খাওয়া শেষ হবার পরেও ওসি সাহেব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কাদের এবং আলম ফিরে এল। ওসি সাহেব খানিকক্ষণ কাদেররের দিকে তাকিয়ে তাকে এ্যারেস্ট না করেই চলে গেলেন।

'বাটারফ্লাই এফেক্ট' নামের একটা বিষয় আছে। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকরা বাটারফ্লাই এফেক্টকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। 'পৃথিবীর এক প্রান্তে প্রজাপতির পাখার কাঁপনে অন্যপ্রান্তে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হতে পারে এই হল বাটারফ্লাই এফেক্ট'।

ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলেজের সামনের রাস্তায় বাটারফ্লাই এফেক্টের লীলাভূমি। কিছুদিন পরপর এইসব রাস্তায় ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটে যার উৎপত্তি হয়ত রেইনফরেস্টের কোনো গাছের পাতার কাঁপন।

ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তায় এই ঘটনাই এখন ঘটছে আমি তার একজন দর্শক।

দু'টা বাসে আগুন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি দোতলা বাস। বাস দু'টির অপারধ কি কেউ বলতে পারছে না। বিনা অপরাধেতো কেউ শাস্তি পায় না। বাস দু'টি নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোনো অপরাধ করেছে।

হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে কয়েকটা প্রাইভেট কারের কাঁচ ভাঙ্গা হয়েছে। মনে হয় আরো হবে। গাড়ির কাঁচ ভাঙ্গার দৃশ্য সুন্দর। কাঁচগুলি পাউডারের মত গুড়া হয়ে যায়। গুড়া অবস্থায় ঝিকমিক করে আলো দেয়।

ঢাকা কলেজের পাশেই সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে পুলিশ ফাড়ি। সেখান থেকে কয়েকজন পুলিশ এসেছিল। ছাত্ররা ধাওয়া করে তারা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফেরত পাঠিয়েছে। পুলিশরা এখন সিগারেট ধরিয়ে রিলাক্স করছে। তাদেরকে আনন্দিত মনে হচ্ছে। অল্পতেই ঝামেলা থেকে উদ্ধারের আনন্দ।

টায়ার জ্বালানো হয়েছে। টায়ার থেকে বুনকা বুনকা ধোঁয়া বের হচ্ছে। আমি মোটামুটি নিরীহ টাইপ একজনকে (তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্র। চেনার উপায় কলেজের মনোগ্রাম বসানো হাফ হাতা সার্ট হিটলার টাইপ গোঁফ রেখেছে, কিন্তু তাকে দেখাচ্ছে চার্লি চ্যাপলিনের মত।) জিজ্ঞেস করলাম, ভাই ঘটনা কি?

তিনি বললেন, ঢাকা কলেজের এক ছাত্রকে ধাক্কা দিয়ে বাস থেকে রাস্তায় ফেলেছে।

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, বলেন কি। ঢাকা কলেজের ছাত্র পরিচয় পাবার পর তাকে তো কোলে করে নামানো দরকার ছিল। কোলে করে নামিয়ে টা টা বাই বাই বলে একটা ফ্লাইং কিস।

আপনি কে?

আমি কেউ না। দর্শক। আপনারা চমৎকার খেলা খেলছেন, দর্শক লাগবে না?

চার্লি চ্যাপলিন হঠাৎ উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। গলা উচিয়ে ডাকতে লাগলেন, হামিদ ভাই! হামিদ ভাই এদিকে আসেন। এই লোক ছাত্রদের নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলছে।

হামিদ ভাই নামে যাকে ডাকা হল তিনি অসম্ভব ব্যস্ত। তিনি পেট্রোল দিয়ে গাড়িতে আগুন ধরানোর দায়িত্বে আছেন। পেট্রোল ভর্তি জেরিকেন নিয়ে ছোটাছুটি করছেন।

আমি বললাম, হামিদ ভাই ব্যস্ত আছেন যা করার আপনাকেই করতে হবে। একটা প্রশ্নের উত্তর দিনতো গাড়িতে আগুন দেয়ার পেট্রোল কি আপনাদের কাছে মজুদ থাকে?

প্রশ্নের উত্তর পাবার আগেই বিকট শব্দে দু'টা ককটেল ফাটলো। একই সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি তাকে টেনে কোলে তুললাম।

এর মধ্যে হামিদ ভাই এসে দাঁড়িয়েছেন। হামিদ ভাই এর পাশে আরেকজন তার হাতে চাপাতি। চাপাতি নিশ্চয়ই মেজে ঘসে রাখা হয়। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে।

হামিদ ভাই বললেন, এই লোক সমস্যা করছে? হ্যালো ব্রাদার আপনি কে?

আমি বললাম, আলাপ পরিচয় পরে হবে। এই মেয়েটাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখে বেচারি আনন্দে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

হামিদ ভাই বললেন, অল্পের উপর ছাড়া পেয়ে গেলেন। এই মেয়ে না থাকলে আপনার আজ খবর ছিল।

চাপাতি ভাইয়া চাপাতি দুলিয়ে কি খবর হতে পারে তার নমুনা দেখালেন।

যে মেয়েটি আমার কোলে তাকে আমি চিনি। তার নাম তানিজা। বেচারী নিশ্চয়ই তার বাবা কিংবা মা'র সঙ্গে এই এলাকায় কেনাকাটা করতে গিয়ে বাটরাফ্লাই এর চক্রে পড়েছে।

তানিজাকে ডাক্তারখানায় নেয়ার আগেই তার জ্ঞান ফিরল। সে বেশ স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে সামান্য কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি বললাম, তানিজা আমাকে চিনেছ?

তানিজা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। ফিস ফিস করে বলল, মা কোথায়?

আমি বললাম, মা নিশ্চয়ই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার কোনো ভয় নেই। আমি যথাসময়ে তোমাকে তোমার মা'র হাতে তুলে দেব। আইসক্রীম খাবে?

হুঁ।

কোন ফ্লেভার?

ভ্যানিলা। আপনার পা খালি কেন?

তানিজা! আমি সব সময় খালি পায়েই থাকি।

কেন?

মাটি হচ্ছে আমাদের মা। মায়ের স্পর্শ শরীরে সারাক্ষণ লাগানো আনন্দের ব্যাপার না?

তানিজা বলল, মাটি মা হলে আপনি তো মা'কে পাড়িয়ে তার উপর হাঁটছেন।

আমি তানিজার যুক্তিতে চমৎকৃত হলাম। শিশুরা মাঝে মাঝে সুন্দর যুক্তি দেয়।

প্রথমে তানিজাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেলাম সেখানে কেউ নেই। দরজায় তালা লাগানো। বাসায় কাজের মেয়ে আছে। সে তালাবদ্ধ যাতে বের হতে না পারে। কাজের মেয়ের কাছে মেসের ঠিকানা দিয়ে এলাম।

পেনসিল ওসি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে জানলাম হারানো শিশুর বিষয়ে এখনো কেউ থানায় যোগাযোগ করে নি।

তানিজা তার মায়ের মোবাইল নাম্বার জানে সেখানে টেলিফোন করা হল কেউ ধরল না। তানিজা তার বাবা কোন অফিসে চাকরি করে তা বলতে পারল না।

তানিজা দুপুরে কি খাবে?

পিজা খাব। আর ঠাণ্ডা কোক খাব। মা আমাকে ঠাণ্ডা কোক খেতে দেয় না।

ঠাণ্ডা কোক খেলে কি হয় জান?

না।

টনসিল ফুলে যায়। জ্বর হয়।

তাহলে তো বিরাট সমস্যা।

দুপুরে আমরা পিজা খেলাম। তানিজা ঠাণ্ডা কোক খেতে খেতে বলল, মামা চল এখন মা'কে খুঁজে বের করি।

মেয়েটা কিছুক্ষণ হল আমাকে মামা ডাকা শুরু করেছে। গোপন কথা বলা শুরু করেছে। আজ তার জন্মদিন এটা জানলাম। জন্মদিনে তার মা রাতে তাকে পিজাহাটে নিয়ে যাবে বলেছিল। এখন যেহেতু দুপুরে পিজা খাওয়া হয়েছে, রাতে না খেলেও চলবে।

মামা তুমি কি জান আমার বাবা আমাদের সঙ্গে থাকে না।

জানি না তো।

মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা থাকে। মা বাবাকে বলল, এই মুহূর্তে তুমি বের হয়ে যাবে। বাবা বলল, এত রাতে আমি কোথায় যাব? মা বলল, জাহান্নামে যাও। বাবা বলল, জাহান্নাম আমি কোথায় পাব?

তোমার বাবাকেতো মনে হচ্ছে রসিক মানুষ।

হুঁ। মা রসিক মানুষ পছন্দ করে না। মা বাবাকে ডাকে গোপাল ভাড়।

গোপাল ভাড় কে তুমি চেন?

আমি চিনি না। আমার মনে হয় সে দুষ্ট লোক। তাই না?

হতে পারে।

বড়দের ঝগড়া করতে হয় না।

অবশ্যই হয় না।

বাবাকে বকে দিও।

নিশ্চয়ই বকে দিব।

মা'কে কিন্তু বকা দিও না। মা খুব রাগী। বকা দিলে মা রাগ করবে।

খুব রাগী হলে তাকে বকা দেব না। রাগী মেয়েদের আমি খুবই ভয় পাই।

আমি আমার মা'কে অল্প ভয় পাই। বাবা বেশি ভয় পায়।

অল্প ভয় পাওয়াই ভাল।

আমরা আবার ঢাকা কলেজের সামনে ফিরে গেলাম। অস্থির মা মেয়ের সন্ধানে সেখানেই ঘোরাঘুরি করার কথা। তাকে পাওয়া গেল না। ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তা পুরোপুরি স্বাভাবিক। গাড়ি চলছে, রিকশা চলছে। ফুটপাত দখল করে হকাররা বসে আছে। কর্মহীন মহিলারা জামা কাপড় দেখে বেড়াচ্ছে। কিছুই তাদের পছন্দ হচ্ছে না। কলেজের ভেতর ক্লাসও মনে হয় শুরু হয়েছে। আমি নিশ্চিত চাপাতিওয়ালা বিছানার নিচে চাপাতি রেখে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রির ক্লাস করছে।

তানিজা বলল, মা'কে পাওয়া না গেলে অসুবিধা নাই। মামা আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

আমি বললাম, আমারও কোনো অসুবিধা নাই। রাতে জন্মদিনের কেক কাটার ব্যবস্থা করতে হবে।

মামা আমি চিড়িয়াখানায় যাব। আমাকে কেউ চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায় নি। মা বলেছিল জন্মদিনে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে।

চল চিড়িয়াখানায় যাই। জীবজন্তু দেখে আসি।

রাতে আমি খাব বার্গার।

বার্গারের সঙ্গে ঠাণ্ডা কোক খাবে না?

হুঁ খাব।

চিড়িয়াখানার জীবজন্তু দেখে আমি তানিজাকে নিয়ে চলে গেলাম সোনারগাঁ হোটেলে। মেয়েটাকে কিছুক্ষণের জন্যে এলিতার হাতে দিয়ে দেয়া যাক। তানিজা এখন বিরতিহীন কথা বলে আমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।

এলিতা আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলে বলল, কি ব্যাপার?

আমি বললাম, তুমি আমাকে একশ ডলার দিয়েছ। আমার পেমেন্ট ঠিক হয় নি। বাকি টাকাটা নিতে এসেছি।

একদিন কাজ করেছ একশ ডলার দিয়েছি।

এয়ারপোর্টে তোমাকে আনতে গিয়েছিলাম। ঐ দিনের হিসবাতো ধর নি।

সরি। আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে এই মেয়েটা কে?

ওকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। ওর নাম তানিজা।

পথে কুড়িয়ে পেয়েছ মানে কি? তোমাদের দেশে কি এমন শিশু পথে কুড়িয়ে পাওয়া যায়?

আমি বললাম, হ্যা আমাদের দেশে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। যথাসময়ে বাবা মা এসে তাদের নিয়ে যায়। তোমার দেশে যে সব শিশু হারিয়ে যায় তাদের কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না। গত বছরের স্ট্যাটিসটিকসে এসেছে তিনশ পনেরো জন শিশু হারিয়েছে যাদের খোঁজ কেউ জানে না। ভুল বলেছি?

এলিতা জবাব দিল না। চুপ করে রইল।

তুমি কি তানিজাকে কিছুক্ষণ রাখতে পারবে? রাত দশটা পর্যন্ত। রাত দশটার মধ্যে তার বাবা এসে মেয়েকে নিয়ে যাবে।

তারা জানবে কিভাবে যে এই মেয়ে আমার কাছে আছে?

জানবে। যে কোনোভাবেই হোক জানবে।

এলিতা বলল, আমি কোনো ঝামেলায় জড়াব না। এই মেয়েকে রাখব না।

আমি বললাম, আজ তোমার জন্মদিন। জন্মদিনে একা একা থাকবে?

জন্মদিন জান কিভাবে?

তুমি নিজের সম্পর্কে যে ই-মেইল পাঠিয়েছ সেখানে জন্মদিন লেখা আছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি জান? আজ তানিজা মেয়েটিরও জন্মদিন।

এলিতা তানিজার তাকিয়ে বলল, হ্যাপি বার্থডে তানিজা। তানিজা মিষ্টি করে হাসল। তানিজা এখনো কথা বলা শুরু করে নি। কথা বলা শুরু করলে এলিতা বুঝবে কি জিনিস রেখে যাচ্ছি।

এলিতার কাছ থেকে একশ ডলার নিয়ে সোনারগাঁ হোটেলের বেকারি থেকে জন্মদিনের কেক কিনে এলিতার ঘরে পাঠিয়ে দিলাম।

কেকের উপর ফুল লতা পাতার ফাঁকে বাংলায় লেখা

তানিজা

এলিতা

হারিয়ে যাওয়া সব সময়ই আনন্দময়।

এলিতার এই বাংলা পড়ে বুঝতে পারার কথা।

মেসে ফিরে দেখি তানিজার মা আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। আমাকে দেখেই তাঁর প্রথম কথা, আমার মেয়ে কই?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আপনার মেয়েকে উপহার হিসেবে একজনকে দিয়ে এসেছি। ঐ মেয়ের ছিল জন্মদিন। জন্মদিনের উপহার।

কি বললেন?

কি বললাম তাতো শুনেছেন। তারপরেও আরেকবার স্পষ্ট করে বলছি, আপনার মেয়েকে উপহার হিসেবে একজনকে দিয়ে এসেছি।

আমি আপনাকে খুন করে ফেলব।

খুন করতে চাইলে করতে পারেন। আসুন ঘরে আসুন। কি পদ্ধতিতে খুন করবেন সেটা শুনি।

আমি আপনাকে র‍্যাবের হাতে তুলে দিব। র‍্যাব আপনাকে ক্রসফায়ারে মারবে।

ক্রসফায়ারে মেরে ফেললে তো আপনি মেয়ের কোনো সন্ধান পাবেন না। ক্রসফায়ারের কথা আপাতত ভুলে যান। আসুন শর্ত নিয়ে আলোচনা করি।

শর্ত মানে। কিসের শর্ত?

যে শর্তে আমি আপনাকে তানিজার সন্ধান দিতে পারি।

মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবেন আবার শর্ত দেবেন? মগের মুল্লুক পেয়েছেন?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমার কাছে মগের মুল্লুক না। আমার কাছে বাংলা মুল্লুক। আপনার কাছে মগের মুল্লুক। স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করে আলাদা হয়ে

যাবেন। মেয়ে হারিয়ে ফেলবেন। যে আপনার মেয়েকে খুঁজে পেয়েছে তাকে ক্রসফায়ারে দেবেন?

কথার কচকচানিতে আমি যাব না। এক্ষুনি আমার মেয়েকে দিতে হবে। যদি না দেন তার পরিণাম ভাল হবে না।

আপনি চিৎকার বন্ধ করে স্বামীকে নিয়ে আসুন। দু'জনে মুচলেকা দিন কখনো ঝগড়া করবেন না তারপর মেয়ের সন্ধান দেব। তার আগে না। ভাল কথা আপনার হাতে সময় কিন্তু বেশি নেই। আপনার মেয়ে দেশের বাইরে চলে যাবে। মনে হয় ইন্ডিয়ায় যাবে। জানেন নিশ্চয়ই ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে গরু আসে, বিনিময়ে আমরা নানান বয়সের মেয়ে পাচার করি।

আমার শেষ কথাতে কাজ হল। তানিজার মা টেলিফোন করে তানিজার বাবাকে আনলেন। এই ভদ্রলোক মেয়ে হারানোর কথা কিছুই জানতেন না। সব শুনে তাঁর হার্ট এ্যাটাকের মত হল। বুকে হাত দিয়ে বিড় বিড় করে বললেন, শাহানা আমার বুকে ব্যথা করছে। আমার বুকে ব্যথা করছে।

শাহানা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, কাগজে কি লিখতে হবে বলুন। আমরা লিখে দিচ্ছি।

আমি বললাম, কিছু লিখতে হবে না। দু'জন এক সঙ্গে মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাবেন এটাই যথেষ্ট। আপনার মেয়ে আছে সোনারগাঁ হোটেলে রুম নাম্বার ৭৩২, এই রুমে একটা পরী থাকে। পরীটার নাম এলিতা। আপনার মেয়েকে পরীর হেফাজতে রেখে এসেছি।

মা-বাবা দু'জনই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তারা আমার কথায় পুরোপুরি বিভ্রান্ত। আমি বললাম, দেরী করবেন না চলে যান।

তানিজার বাবার মনে হয় আবার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। তিনি বুকে হাত দিয়ে কুঁ কুঁ শব্দ করছেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েকে দেখতে পাবেন। উঠে দাঁড়ান তো।

তানিজার বাবা বললেন, ভাই আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।

আমি বললাম, আজ রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ হাঁটব তারপর আমার এক খালাতো ভাই বাদলের সন্ধানে যাব। ওকে অনেক দিন দেখি না।

তানিজার বাবা কাঁদো কঁদো গলায় বললেন, ভাই মেয়েটাকে পাব তো?

আমি বললাম, অবশ্যই পাবেন। স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে ভালবাসা এবং মমতায় তাকে রাখবেন। আপনাদের মধ্যে ঝগড়া হলে এই মেয়ে আবারো হারিয়ে যাবে। এটা যেন মাথায় থাকে। দ্বিতীয়বার হারিয়ে গেলেও ফেরত পাবেন। তৃতীয়বার হারালে আর পাবেন না। একে বলে দানে দানে তিন দান। তিনের চক্র।

বেল টিপতেই মেজো খালু (বাদলের বাবা) দরজা খুলে দিলেন, আমাকে দেখে হাহাকার ধ্বনি তুললেন, হিমু সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোমার খালা চলে গেছেন।

খালা চলে গেলে খালুর খুশি হওয়া উচিত। উনি মনের সুখে ছাদে বোতল নিয়ে বসতে পারবেন। হাহাকার ধ্বনির অর্থ বুঝলাম না।

খালু হতাশ গলায় বললেন, দুপুরে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছে। সে শাহরুখ খানের প্রোগ্রাম দেখবে। আমি বললাম পুরুষ মানুষের স্টেজে ফালাফালি করবে এটা দেখার কি আছে। তোমার খালা বলল, আমি তোমার সঙ্গে বাস করব না। আমি বললাম, নো প্রবলেম। গো টু শাহরুখ খান। তার কোমড় জড়িয়ে ধরে নৃত্য কর। কথা শেষ করার আধঘণ্টার মাথায় সে স্যুটকেস গুছিয়ে চলে গেল।

আমি বললাম, শাহরুখ খানের কাছে নিশ্চয়ই যান নি। নিজের বাবার বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন। আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন?

খালু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, মূল ঘটনা তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার খালা কিংখানের কাছে গেলেও আমার কিছু যায় আসে না। সে আমাকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছে। আমার বোতল নিয়ে গেছে।

বলেন কি! উনিও বোতল ধরেছেন?

সব কিছু নিয়ে ফাজলামি করবে না। ঘটনা বুঝার চেষ্টা কর। আমি একটা সিঙ্গেল মল্ট হুইস্কি এনে রেখেছি। শুভদিন দেখে বোতল খুলব। তোমার খালা চলে গেছেন এটা একটা শুভ দিন। বরফ গ্লাস সব নিয়ে বোতলের খোঁজ করতে দেখি বোতল নাই। তোমার অতি চালাক খালা আমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এই কাজ করেছে। এখন কি করি বল।

বরফ মেশানো পানি খেয়ে শুয়ে থাকবেন?

আবার ফাজলামি? তুমি গাড়ি নিয়ে যাও। তোমার অতি চালাক খালার কাছ থেকে বোতল রিলিজ করে নিয়ে আস।

আমি বললাম, খালা মদের বোতল নিয়ে তার বাবার বাড়িতে যাবেন না। আপনার বোতল তিনি কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।

কোথায় লুকিয়ে রাখবে?

নিজের শোবার ঘরে রাখবেন না। সেখানে ধর্মের বই পত্র আছে। বোতল ভেঙ্গে ফেলেও দিবেন না। বাঙ্গালী মেয়েরা দামি জিনিস তা সে যতই ক্ষতিকর হোক, ফেলে না। ডেট এক্সপায়ার হওয়া অষুধও জমা করে রাখে।

খালু ধমক দিয়ে বললেন, মূল কথায় আস। তোমার বুদ্ধিমতী খালা বোতল কোথায় লুকিয়েছে?

আমার ধারণা তার বাথরুমে। বেসিনের নিচের কাবার্ডে যেখানে ফিনাইল জাতীয় জিনিসপত্র থাকে, কিংবা বাথরুমে ডাস্টবিনে।

খালু অলিম্পিকের দৌড় দিয়ে ছুটে গেলেন এবং অলিম্পিকের সোনা পাওয়ার মত মুখ করে বোতল কোলে ফিরে এসে জড়ানো গলায় বললেন, "হিমু ছাদে আস।" বোতল কোলে নিয়েই তাঁর নেশা হয়ে গেছে।

দু'জন ছাদে বসে আছি। খালু সাহেব আশংকাজনক গতিতে বোতল নামিয়ে দিচ্ছেন। আমার প্রতি মমতা এবং ভালবাসায় তিনি এখন সিক্ত।

হিমু।

জি খালু সাহেব।

আমি যে তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি তা-কি তুমি জান?

জানতাম না। এখন জেনেছি।

তোমাকে দেখলে বিরক্ত হবার মত ভাব করতাম, এটা আসলে অভিনয়। আমি সেই ব্যক্তি যে মনের ভাব গোপন রাখতে পছন্দ করে। এই বিষয়ে কবিগুরুর একটা লাইন আছে। এখন মনে পড়ছে না। মনে করার চেষ্টা করছি।

চেষ্টা করার দরকার নেই। মনে পড়লে পড়বে।

আমার কি ধারণা হিমু, আমি তোমার খালাকেও পন্দ করি? তাকে গো টু কিংখান বলা ঠিক হয় নি। হিমু! তোমার কি ধারণা বেহেশতো দোজখ এই সব কি আছে? (পেটে জিনিস বেশি পড়লে খালু সাহেব ধর্ম নিয়ে আলোচনায় চলে যান।)

আমি বললাম, ধর্ম আলোচনাটা থাক।

তোমার কি ধারণা আমি মাতাল হয়ে গেছি? এখনো আমার লজিক পরিষ্কার দশ থেকে উল্টা দিকে গুনতে পারব। দশ নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক। হয়েছে?

হয়েছে।

একশ থেকে উল্টা দিকে গুনে এক পর্যন্ত আসতে পারব। শুরু করব?

না। আপনার নেশা কেটে যেতে পারে। ঘুমিয়েও পড়তে পারেন।

ঘুমিয়ে পড়ব কেন?

সংখ্যা নিয়ে গুনাগুনি শুরু করলে ঘুম আসে। মানুষ ভেড়া গুনতে গুনতে ঘুমায়।

খালু সাহেব গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে গণনা শুরু করলেন, একশ নিরানব্বই, আটানব্বই সাতানব্বই... ....
বিরাশি পর্যন্ত এসে তিনি গভীর ঘুমে আছন্ন হলেন। আমি 'নেশা' বিষয়ে আমার বাবার উপদেশ মনে করার চেষ্টা করলাম।

নেশা

পুত্র হিমু! নেশাগ্রস্ত মানুষের আশেপাশে থাকা আনন্দময় অভিজ্ঞতা। নেশাগ্রস্ত মানুষে মনের দরজা খুলে এবং বন্ধ হয়। কখন খুলছে কখন বন্ধ হচ্ছে তা সে বুঝতে পারে না। তুমি নেশাগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে এই বিষয়টি ধরতে চেষ্টা করবে। মহাপুরুষরা কোনো নেশার বস্তু গ্রহণ করা ছাড়াই তার মনের দরজা খুলতে পারেন এবং বন্ধ করতে পারেন। আমি নিশ্চিত একদিন তুমিও তা পারবে।

এলিতা আমার ঘরে বসে আছে। তার চোখ ফোলা, মনে হয় একটু আগে কেঁদেছে। আমেরিকান মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের মত অকারণে কাঁদে কি-না তাও জানি না। মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ এবং প্রচণ্ড দুঃখে মানুষ ঠোঁট কামড়ায়। মেয়েরা নিচের ঠোঁট, পুরুষরা উপরের। এলিতা দু'টা ঠোঁটই কামড়াচ্ছে।

তার সমস্যা কি?

আমি বললাম, চা খাবে?

এলিতা প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাল। সে চা খাবে না। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে সে আবারো কান্নার উপক্রম করছে। আমি বললাম, কি সমস্যা?

এলিতা হাহাকার ধ্বনি তুলে বলল, আমার ক্যামেরা পকেটমার হয়েছে।

আমি বললাম, তোমার বাংলা ভুল হয়েছে। পকেট থেকে কিছু চুরি হলে পকেটমার। তোমার এই বিশাল ক্যামেরা কোনো পকেটে আটবে না। হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে?

হুঁ।

তাহলে ছিনতাই হয়েছে। ছিনতাই চোখের সামনে হয়। পকেটমার হয় আড়ালে।

আমি তোমার কাছে বাংলা শিখতে আসি নি।

কি জন্যে এসেছ?

ঘটনাটা জানাতে, আমার সব ছবি এই ক্যামেরায়। কি চমৎকার সব ছবি তুলেছি।

আবার তুলবে।

পাগলের মত কথা বলছ কেন? কোন ছবিই দ্বিতীয়বার তুলা যায় না।

যাবে না কেন?

প্রথম তোলা ছবির লাইট দ্বিতীয়বার ঠিক থাকে না। পৃথিবী ঘুরছে আলো প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে।

পৃথিবী স্থির হয়ে থাকলে একই ছবি দ্বিতীয়বার তুলা যেত?

প্লীজ স্টপ ইট। তোমার সঙ্গে বক বক করতে ইচ্ছা করছে না। কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

কাঁদো। তোমাকে কাঁদতেতো কেউ নিষেধ করছে না। কেঁদে মন ঠিক কর। কেঁদে কেঁদে বিজ্ঞানী নিউটন হয়ে যাও।

তার মানে কি?

বিজ্ঞানী নিউটন বিশাল এক অংকের বই এর পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। নাম 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা' তার আদরের কুকুর জ্বলন্ত মোমবাতি ফেলে পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলে। নিউটন বইটা আবার নতুন করে লেখেন। তুমিও নতুন করে ছবি তুলবে।

আমি যে সব মোমেন্ট ক্যামেরায় ধরেছি সেগুলি কোথায় পাব?

নতুন মোমেন্ট তৈরি হবে।

এলিতা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, তোমার কাছে আসাই আমার ভুল হয়েছে। আমাকে শুধু একটা কথা বল, তোমাদের পুলিশ কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?

অবশ্যই পারবে। তারা ছিনতাই এর পুরো ঘটনাটা লিখবে। কোথায় ছিনতাই হয়েছে ক্যামেরার দাম। ছিনতাইকারীর চেহারার বর্ণনা সব লেখা হবে। একে বলে General Diary সংক্ষেপে GD. লেখালেখির পর তুমি চলে আসবে পুলিশ খাতা বন্ধ করে চা খাবে, পা নাচাবে।

তুমি বলতে চাচ্ছ এইসব লেখালেখি অর্থহীন?

সবকিছুইতো অর্থহীন। পৃথিবী যে ঘুরছে এটা অর্থহীন না। না ঘুরলে কি ক্ষতি হত?

এলিতা মুখ কঠিন করে বলল, আমি যাচ্ছি।

আমি বললাম, হোটেলে গিয়ে তো মন খারাপ করেই থাকবে তারচে চল ধোঁয়া বাবা'র কাছে যাই। দেখি তিনি কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন কি-না।

ধোঁয়া বাবা মানে?

ইংরেজিতে Smoke Father. একজন আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। জ্বিন পরী এইসব অদৃশ্য প্রাণী পুষেন। তিনি অনেক কিছু বলতে পারেন। এমনও হতে পারে তোমার ক্যামেরা কোথায় আছে তার সন্ধান দিলেন। ক্যামেরা উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন।

এলিতা বলল, দিস ইজ বুলশীট।

আমি বললাম, বুলশীট হোক বা কাউ ডাং হোক চেষ্টা করতে দোষ কি। কবি বলেছেন,

"নাই কোনো শেষটা
করে যা চেষ্টা।"

ডুবন্ত মানুষ খড়খুটা ধরে ভেসে উঠতে চায়। ক্যামেরার শোকে অস্থির তরুণী ধোঁয়া বাবা ধরবে এটাই স্বাভাবিক।

নৌকায় বুড়িগঙ্গা পাড় হচ্ছি। এলিতা নিজেকে কিছুটা সামলেছে, অবাক হয়ে চারপাশ দেখছে। অবাক হবার মত কিছু চারপাশে নেই। ময়লা আবর্জনায় দূষিত এবং বিষাক্ত নদী। লঞ্চ স্টিমার ভোঁ ভোঁ করছে। অসংখ্য নৌকা ভাসছে। দেখে মনে হচ্ছে পানিতে ঘোঁই পাকানো ছাড়া এদের কারোরই কোনো গন্তব্য নেই। নৌকা দুলছে, এলিতা মনে হয় খানিকটা ভয় পাচ্ছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, নৌকা ডুবে যাবে নাতো?

আমি বললাম, ডুবতে পারে। তুমি সাঁতার জান না?

না।

আমি বললাম, সাঁতার জেনে মরার চেয়ে সাঁতার না জেনে মরে যাওয়া ভাল।

ভাল কেন?

অল্প পরিশ্রমে মৃত্যু। বাঁচার জন্যে হাত পা ছুড়ে ক্লান্ত হতে হবে না। তাছাড়া পানিতে ডুবে মরার জন্যে এই সময়টা বেশ ভাল।

কেন?

পানি গরম। শীতের সময় নদীর পানি থাকে গরম।

তোমার উদ্ভট কথা শোনার মানে হয় না। আর একটি কথাও বলবে না। শুধু যদি কিছু জানতে চাই তার উত্তর দেবে।

আচ্ছা।

আমরা যার কাছে যাচ্ছি, স্মোক ফাদার। তাকে কি টাকা পয়সা দিতে হবে।

খুশি হয়ে কিছু দিলে উনি নেন। না দিলেও অসুবিধা নেই। উনার চাহিদা অল্প। ধোঁয়া খেয়ে বাঁচেন তো। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটের ঝামেলা নেই। ফ্রেস ধোঁয়া হলেই চলে।

তুমি বলতে চাচ্ছ উনি ধোঁয়া খেয়ে বাঁচেন?

সবাই তাই বলে।

আমাকে এইসব তামশা বিশ্বাস করতে বলছ?

বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার। তবে বিশ্বাস করাই নিরাপদ। কারণ কবি বলেছেন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

এলিতা বলল, তোমার সঙ্গে আসা ভুল হয়েছে। ক্যামেরার শোকে অস্থির ছিলাম। লজিক কাজ করছিল না। ঠিক করে বল তোমার অন্য কোনো মতলব নেইতো? ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে নির্জন কোনো জায়গায় নিয়ে যাবার মতলব করবে না। আমি ক্যারাটে জানি। ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া মেয়ে তাছাড়া আমার সঙ্গে স্প্রে আছে।

স্প্রেটা কি?

আমেরিকান মেয়েরা নিজেদের প্রটেক্ট করার জন্যে ব্যাগে স্প্রে রাখে। চোখের উপর স্প্রে দিয়ে দিলে জন্মের মত অন্ধ হয়ে যাবে।

তোমার সঙ্গে স্প্রে আছে?

অবশ্যই। আমি স্প্রে ছাড়া চলাফেরা করি না। স্প্রে ব্যাগে আছে।

তোমার সঙ্গেতো ব্যাগ নেই। আমার ধারণা ক্যামেরার সঙ্গে তোমার হ্যান্ডব্যাগও ছিনতাইকারী নিয়ে গেছে। সে এখন মলমপার্টি হয়ে গেছে। স্প্রে মেরে পথচারীকে অন্ধ করে টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছে।

এলিতা কঠিন চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ডাগর আঁখির কারণে চোখে কাঠিন্য আসছে না।

আমরা ধোঁয়া বাবার আস্তানায় সন্ধ্যা মেলানোর আগে আগে পৌঁছালাম। প্রচুর দর্শনার্থী বাবার জন্যে অপেক্ষা করছে তবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডাক পেলাম।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘর। এক কোনায় লাল গামছা কোমড়ে জড়িয়ে ধোঁয়া বাবা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসে আছেন। তাঁর মাথার উপর লাল সালুর চাদর। একপাশে মালশায় ঘনঘনে কয়লার আগুন মাঝে মধ্যে সেখানে ধূপের দানা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ধূপের গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ সব মিলিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসার মত পরিবেশ। বাবার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তিনি মাঝে মাঝে কারণ ছাড়াই বিকট হা করছেন তখন মুখের ভেতরে লাল জিভ দেখ যাচ্ছে মুখের ভেতরটা থাকে অন্ধকার। অন্ধকারে লাল জিভ কেন দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। আলো বিশেষজ্ঞ এলিতা হয়ত বলতে পারবে।

এলিতা বলল, Oh God. What is this.

ধোঁয়া বাবা বললেন , হিমু ভাই আছেন কেমন?

আমি বললাম, ভাল।

শাদা চামড়ার এই ছেমড়ি কে?

ফটোগ্রাফার। সমস্যায় পড়ে এসেছে।

ছেমড়ি বাংলা বুঝে?

খুব যে বুঝে তা বলা যাবে না।

ধোঁয়া বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, আমিতো হালার ইংরেজি জানি না। ছেমড়ির সঙ্গে কথা কমু ক্যামনে?

যা পারেন বলেন। আমি দোভাষির কাজ করব।

ছেমড়িরে বলেন, তার কি সমস্যা যেন বলে।

আমি এলিতাকে বললাম, তোমার কি সমস্যা বাবাকে বুঝিয়ে বল। বাবা শুনতে চাচ্ছেন।

এলিতা বলল (ইংরেজিতে), আমি নিজেকে এইসব বুজরুকির সঙ্গে জড়াতে চাচ্ছি না। ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আমি বললাম, শুরু যখন করেছে শেষটা দেখ। ক্যামেরা হারিয়েছে এটা বল।

এলিতা কঠিন গলায় বলল, আমি কিছুই বলব না। ন্যুইসেন্সের সঙ্গে যুক্ত হব না। আমাকে বোকা মনে করার কোন কারণ নেই।

ধোঁয়া বাবা বললেন, ছেমড়ি চিল্লায় কেন?

আমি বললাম, মনের দুঃখে চিৎকার করছে। দামী ক্যামেরা হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে।

ক্যামেরা গেছে কোন জায়গায়?

ধোঁয়া বাবার এই বাংলা এলিতা বুঝতে পারল। সে বিরক্ত গলায় বলল, সোনারগাঁ হোটেলের সামনে।

কি ক্যামেরা?

নাইকন। আমি আর কিছু বলব না। আমি বাইরে যাব। আমার চোখ 'Hot' হয়েছে। এলিতা চোখ ডলতে ডলতে ঘর থেকে বের হল। ধোঁয়া বাবা বললেন, হিমুভাই বসেন। অনেক দিন পরে আপনারে দেখে মনে আনন্দ হয়েছে।

আমি বললাম, আনন্দের হাত ধরে আসে নিরানন্দ।

ধোঁয়া বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাও ঠিক। কানাঘুসা চলতেছে। যে কোনদিন পুলিশের হাতে ধরা খাব।

ক্যামেরা কি পাওয়া যাবে?

সিদ্দিকের এলাকা। পাওয়াতো যাবেই। কতক্ষণে পাওয়া যায় সেটা কথা। আপনি শাদা ছেমড়ি নিয়ে অপেক্ষা করেন। আমি পাত্তা লাগাই। রাতে খাওয়া দাওয়া না করে যাবেন না। দাওয়াত কবুল করেছেন?

করলাম।

শুকরিয়া।

ধোঁয়া বাবার ঘরের ধোঁয়া কমে আসছিল। বাবার নির্দেশে একজন এসে ধোঁয়া বাড়িয়ে দিল। বাবা ক্ষীণ গলায় ডাকলেন, হিমু ভাই।

আমি বললাম, কি বলতে চান বলে ফেলুন।

মৃত্যুভয় ঢুকেছে বুঝেছেন। পেরায় রাতেই স্বপ্ন দেখি ফাঁসির দড়িতে ঝুলতেছি কিন্তু মরণ হচ্ছে না। বিরাট কষ্টের ব্যাপার। কি করি বলেন তো।

ধোঁয়া খেতে থাকুন আর কি করবেন।

ধোঁয়া বাবার আস্তানায় এলিতাকে নিয়ে রাতের খাবার খেলাম। কাচ্চি বিরিয়ানি, মুরগির রোস্ট, দৈ মিষ্টি। এলিতা বলল, অদ্ভুত রান্না। এত ভাল খাবার কম খেয়েছি।

আমি বললাম, পীর ফকিরদের দরবারে খানা সব সময় ভাল হয়।

ডিনার শেষ হবার আগেই এলিতার ক্যামেরা চলে এল। ক্যামেরার সঙ্গে তার চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর নিশ্চয়ই স্প্রেটাও আছে। চোখ অন্ধ করার স্প্রে।

এলিতা আবারো বলল, Oh God. এটা কিভাবে সম্ভব?

আমি বললাম, এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব আবার সবই অসম্ভব। আমার ধারণা বাবা জ্বীন পরীদের সাহায্যে কাজটা করেছেন।

এলিতা বলল, Holy man ধোঁয়া বাবা যে এত পাওয়ারফুল তা আগে বুঝতে পারি নি। আমি তাঁর Dociple হতে চাই। এটা কি সম্ভব?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই একটু আগেইতো বলেছি পৃথিবীতে সবই সম্ভব আবার সবই অসম্ভব। ক্যামেরায় যে সব ছবি তুলেছ সেগুলি ঠিক আছে কি-না আগে দেখ। ধোঁয়া বাবার শিষ্য হবার চিন্তা বাদ দাও। উনার শিষ্য হলে সমস্যা আছে।

কি সমস্যা?

রাতে দুঃস্বপ্ন দেখবে। ফাঁসিতে ঝুলছ কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে না। মৃত্যুর জন্যে একজন ছটফট করছে কিন্তু সে মরতে পারছে না, বিরাট কষ্টের ব্যাপার না?

এলিতা হতাশ গলায় বলল, You are so confusing.

আমি একাতো না। আমরা সবাই confused প্রাচীন মায়া সভ্যতায় বলা হয়, ঈশ্বর নিজেও confused বলেই আমরা সবাই confused .

সোনারগাঁ হোটেলে তাকে নামিয়ে চলে আসছি সে আমাকে চমকে দিয়ে বলল, হিমু! তুমি আজ থেকে যাও।

আমি বললাম, কোথায় থাকব?

আমার ঘরে থাকবে। আমরা সারারাত গল্প করব।

আমি বললাম, হায় সখা এত স্বর্গপুরী নয় পুষ্পে কীট সম হেতা তৃষ্ণা জেগে রয়।

এলিতা বলল, এর মানে কি?

আমি বললাম, কবিতার লাইন। ব্যাখ্যা করা কঠিন।

এলিতা বলল, এর মানে কি এই যে তুমি থাকবে না।

আমি বললাম, ঠিকই ধরেছ। আমি যাই। তুমি আরাম করে ঘুমাও।

আমি হাঁটা ধরেছি এলিতা তাকিয়ে আছে।

ঢাকা শহরের রাতে আকাশ দেখা যায় না বলে পথচারীদের মাঝে মাঝে খুব সমস্যা হয়। আকাশে হয়ত ঘন মেঘ করেছে, বেচারা বুঝতে পারল না। হুড়মুড়িয়ে নামল বৃষ্টি। শোবার ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে যে আছে সে তখন মনের আনন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা যাপন পড়তে পারে। পথে যে নেমেছে তার মহাবিপদ। বৃষ্টি শুরু হলেই রিকশা সিএনজি কিছুই পাওয়া যাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তায় পানি উঠে যাবে। সেই পানিতে এক সময় ফুটপাত ঢেকে যাবে। ম্যানহোল সবই ফুটপাতে। এই শহরে ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি করে এমন একদল মানুষই আছে। তারা সেরদরে ম্যানহোলের ঢাকানা বেচে কিংবা কটকটিওয়ালার কাছে ঢাকনার বিনিময়ে কটকটি কিনে খায়। রাতের ঢাকায় বৃষ্টি হচ্ছে আর কেউ ম্যানহোলের ভেতর ঢুকে যায় না এমন ইতিহাস নেই।

ফুটপাতে পানি উঠে গেছে কাজেই ফুটপাত ছেড়ে আমি পথে নেমেছি। আমার গা ঘেঁসে একটা প্রাইভেট কার গেল। আমি কাদার পানিতে মাখামাখি। প্রাইভেট কারের জানালা খুলে একজন মাথা বের করে বলল, 'দাদা! সরি।'

গাড়ির ভেতর থেকে প্রবল হাসির শব্দ ভেসে এল। বিচিত্র কারণে অন্যের দুর্দশায় আমরা আনন্দ পাই।

সারাগায়ে কাদাপানি মেখে আমি দাঁড়িয়ে আছি। বিরামহীন বৃষ্টি পড়ছে। গায়ের কাদা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যাবার কথা, তা যাচ্ছে না। আমার ইচ্ছা করছে সোগারগাঁ হোটেলে ফিরে এলিতাকে বলা, "আজ রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা।"

আরেটা গাড়ি এসে আমাকে দ্বিতীয়বার ভিজিয়ে দিল। মজা মন্দ না। আমার ধারণা একের পর এক গাড়ি আসবে অসহায় পথচারীকে ভিজিয়ে আনন্দ পাবে। নিশিরাতে মানুষকে আনন্দ দিতে পারছি এটা খারাপ না।

আমি অপেক্ষা করছি এমন একটা গাড়ির যে দূর থেকে আমাকে দেখে গতি কমিয়ে দেবে। এই গাড়ি আমার গা ঘেঁসে যাবে কিন্তু আমাকে ভিজাবে না। এমন ঘটনা ঘটার পর আমি মেসে ফিরব তার আগে না।

মজার এক খেলা শুরু হয়েছে। দূর থেকে গাড়ির হেড লাইট দেখা মাত্র আমি রুমাঞ্চিত বোধ করছি এই গাড়ি মনে হয় আমাকে ভিজাবে না।

ঝাঁ ঝম। পাজোরা গাড়ি আমাকে ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এবার আসছে এক চক্ষু গাড়ি। নিশ্চয়ই ট্রাক। ট্রাকের দু'টা হেড লাইটের একটা বেশির ভাগ সময় নষ্ট থাকে।

ঝাঁ ঝম! ট্রাকও ভিজিয়ে দিল। দেখা যাক এবার কি আসে। আমার কাজ অপেক্ষা করা আমি অপেক্ষা করছি।

ঝড় বৃষ্টির রাতের জন্যে ঢাকা শহরে বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাণী অপেক্ষা করে। এই তথ্য আর কেউ জানুক না জানুক টহল পুলিশরা জানে। এই প্রাণীগুলি দেখতে মানুষের মত তবে সামান্য লম্বা। এরা রাতের অন্ধকারেও চোখে কালো চশমা পরে থাকে বলে এদের চোখ দেখা যায় না। শীত গ্রীষ্ম সব সময় এরা হাতে গ্লাভস পরে থাকে বলে হাতও দেখা যায় না। একা কাউকে পেলেই এরা কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। পাখির মত কিচকিচ করে কথা বলে। হ্যান্ডসেকের জন্যে হাত বাড়ায়।

একবার এদের একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কেন জানি মনে হচ্ছে আজও দেখা হবে। আমি এদের নাম দিয়েছি পক্ষীমানব।

টহল পুলিশরা বলে 'বেজাত'। এদের কোনো জাত নেই।

একটা প্রাইভেট কার শ্লো করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পেছনের সীটে বসা আরোহী জানালা খুলে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ভাই! আপনার কোনো সমস্যা।

কোনো সমস্যা নেই।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাসা কোথায় বলুন। নামিয়ে দিচ্ছি।

ভদ্রলোকের চোখে কালো চশমা। উনি কি পক্ষীমানবদের কেউ?

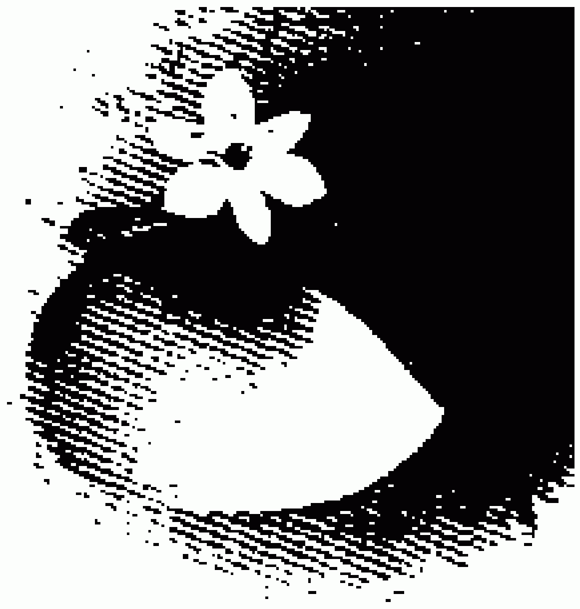

বৃষ্টিতে ভেজার ফল ফলেছে, জ্বরের ঘোরে শরীর ও চেতনা আচ্ছন্ন। কড়া ঘুমের অষুধ খাবার পরেও ঘুম না এলে যেমন লাগছে আমার ঠিক সে রকম লাগছে। শরীরের একটা অংশ ঘুমিয়ে পড়েছে অন্য অংশ জেগে আছে। সুপ্তি ও জাগরণের মাঝামাঝি ত্রিশংকু অবস্থা। স্বপ্ন দেখছি, স্বপ্ন ভেঙ্গে যাচ্ছে। প্রতিটি স্বপ্নেই আবহ সংগীত হিসেবে বৃষ্টির শব্দ। স্বপ্নে ফিলর হিসাবে পক্ষীমানবকে দেখছি। তিনি উদ্বিগ্ন গলায় বলছেন, আপনার কি সমস্যা?

একটা স্বপ্নে এলিতাকে দেখলাম। তার হাতে ক্যামেরা। আমার হাতে সানগান। আমি আলো ফেলছি, এলিতা ছবি তুলছে। আমরা এগুচ্ছি পিচ্ছিল সুরঙের ভেতর দিয়ে। সুরঙ্গের গায়ে প্রাচীন মানুষদের আঁকা ছবি। এলিতা ক্যামেরায় সেই সব দৃশ্য ধরছে। সে দু'টা বাইসনের পেছনে একদল শিকারির ছবি তুলল। স্বপ্নে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। যেমন বাইসনের ছবি তোলার সময় এলিতা বাইসনদের বলল, তোমরা একটু আমার দিকে ফের। আমি তোমাদের চোখ পাচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে দু'টা বাইসন ক্যামেরার দিকে ফিরল। স্বপ্নে ব্যাপারটাকে মোটেই অস্বাভাবিক মনে হল না।

আমার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। যে পানি ঢালছে তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। শুধু কানের পাশ দিয়ে নেমে যাওয়া শীতল পানির স্রোত অনুভব করছি। এতে আমার সুবিধা হচ্ছে পানি যে ঢালছে তাকে কল্পনা করে নিতে পারছি। তার সঙ্গে মনে মনে কথাবার্তা বলছি।

কল্পনা করছি মাজেদা খালা পানি ঢালছেন। তার গা থেকে কড়া জর্দার গন্ধ আসছে। মাজেদা খালা বললেন, জ্বর কিভাবে বাঁধালি? বৃষ্টিতে ভিজেছিস?

হুঁ।

তোর সঙ্গে এলিতা মেয়েটা ছিল?

না।

ওকে সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজলি না কেন?

লাভ কি?

বৃষ্টি ভিজাভিজি থেকে প্রেম হয়। হিন্দী সিরিয়েলে দেখেছি।

এলিতার প্রসঙ্গ আসতেই মাজেদা খালার জায়গায় এলিতা চলে এল। এখন সে পানি ঢালছে। একই সঙ্গে চুলে আংগুল বুলাচ্ছে।

হ্যালো হিমু।

হ্যালো।

আমার কথা শুনে হোটেলে থেকে গেলে আজ এমন জ্বরে কাতরাতে না।

হুঁ।

সারারাত দু'জনে গল্প করতাম। আমার ঝুড়িতে অনেক গল্প।

হুঁ।

একটা লাভ হয়েছে ভুল করে শিখেছ।

সবাই ভুল থেকে শেখে না। কেউ কেউ আছে একের পর এক ভুল করেই যায়।

এলিতা মিলিয়ে গেল তখন চলে এলেন আমার মা। তবে তিনি এলেন বাচ্চা একটা মেয়ে হয়ে। মেয়েটি আমার চেনা, তানিজা। মেয়েটির এক হাতে তার বাবার জুতা জোড়া তারপরেও সে আমার মাথায় পানি ঢালছে এবং চুল বিলি করে দিচ্ছে। জ্বরে অর্ধচেতন অবস্থায় সবই সম্ভব। আমার শিশু ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতে চাইছেন। তবে গানের কথা এলোমেলো। প্রতিটি লাইনের শেষে সুরেলা লম্বা টান আছে–

কে ঘুমালো রে

পাড়া জুড়ালো রে

বর্গি কোথায় রে..........

গান থামিয়ে মা বললেন, তোকে আমি একটা হলুদ ছাতা কিনে দেব। এরপর থেকে হলুদ ছাতা মাথায় দিয়ে রোদে ঘুরবি, বৃষ্টিতে যাবি। তোর কিছু হবে না।

প্রবল জ্বরে কতদিন আচ্ছন্ন ছিলাম তা জানি না। কখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাও জানি না। এখন মোটামুটিভাবে হলেও বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসতে পারছি। চামুচে করে নিজে নিজে স্যুপ খেতে পারছি। স্যুপ বিস্বাদ, এও ব্যাধির অংশ। শরীর ব্যাধি মুক্ত হলে স্যুপ তার স্বাদ ফিরে পাবে।

সকাল। আমার সামনে হাসপাতালের ব্রেকফাস্ট। ডিম সিদ্ধ, কলা, পাউরুটি জেলি।

হাসপাতালের বিছানা ঘেঁসে পেনসিল ওসি সাহেব বসে আছেন। আমি তাঁর নাম মনে করতে পারছি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে পড়বে। ব্রেইন খাতা পত্র উল্টে নাম খোঁজা শুরু করেছে।

ওসি সাহেব বললেন, আপনি নাশতা খাচ্ছেন দেখে ভাল লাগছে। নিউমোনিয়ায় আপনার দু'টা লাংসই আক্রান্ত হয়েছিল। একটা পর্যায়ে ডাক্তাররা পর্যন্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমি হাসলাম। এই হাসির সঙ্গে রোগমুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। হাসার কারণ ওসি সাহেবের নাম মনে পড়েছে। তাঁর নাম আবুল কালাম তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র।

ওসি সাহেব আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে আপনার আমেরিকান বান্ধবী এলিতা। হাসপাতালের খরচপাতিও সে দিচ্ছে।

আমি বললাম, এলিতা কি দেখতে আলতা মেয়েটির মত?

ওসি সাহেব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, কিভাবে বুঝলেন?

আমি বললাম, কোনো অলৌকিক উপায়ে বুঝি নি। আলতার কথা বলার সময় আপনার গলার স্বর যেভাবে কোমল হয়ে যেত এলিতার কথা বলার সময় আপনার গলা একই ভাবে কোমল হয়েছে।

ওসি সাহেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। গম্ভীর গলায় বললেন, যাই। আপনি ভালমত সুস্থ হয়ে উঠুন আপনার সঙ্গে কথা আছে। জরুরী কথা।

এখন বলুন।

না। এখনও বলার সময় আসে নি।

এলিতা এসেছে। তার চোখ মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। আমার রোগমুক্তি দেখে সে আনন্দিত এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। অন্য কোনো কারণ আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা জানা যাবে।

কারণ জানা গেল। এই ক'দিনে সে অসম্ভব ভাল কিছু ছবি তুলেছে। এর মধ্যে একটি ছবি হল, ছয় সাত বছরের একটা নগ্ন ছেলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে পাউরুটি খাচ্ছে। পাউরুটি যেন ভিজে না যায় সে জন্যে একটা হাত মেলে সে ছাতার মত পাউরুটির উপর ধরে আছে।

এলিতা বলল, তোমার অসুস্থ অবস্থায় একটা ছবি আছে। ছবিটা প্রিন্ট করে তোমাকে দেখাব। ছবি দেখে সঙ্গে সঙ্গে তোমার চোখে পানি আসবে। তানিজা মেয়েটি তার মা'কে নিয়ে তোমাকে দেখতে এসেছিল।

সে তোমাকে হলি জমজম ওয়াটার খাওয়াবে। বোতলে করে সে হলি ওয়াটার নিয়ে এসেছে। চামচে করে তোমার মুখে মেয়েটা পানি ধরেছে সেই পানি তোমার গাল বেয়ে নিচে নামছে। একই সঙ্গে মেয়েটা কাঁদছে। তোমার গালের পানি এবং মেয়েটার গালের পানি চকচক করছে। ন্যাচারাল আলোয় তোলা ছবি। অসাধারণ।

আমি বললাম, তোমার ছবির সাবজেক্ট হতে পেরেছি এতে আমি খুশি। তুমি আমার চিকিৎসার খরচ কেন দিয়েছ ব্যাখ্যা করলে ডাবল খুশি হব।

টাকা ফেরত দেবে?

কিভাবে দেব? আমি অন্যের টাকায় প্রতিপালিত ভিক্ষুক বিশেষ।

অন্যের দয়া গ্রহণ করতে তোমার সমস্যা হয় না?

সৃষ্টিকর্তার দয়া গ্রহণ করতে যদি আমার সমস্যা না হয় তাহলে অন্যের দয়া গ্রহণ করতে সমস্যা কেন? সব মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর প্রকাশিত। কাজেই আমি শুধুমাত্র ঈশ্বরের দয়াই নিচ্ছি।

এলিতা মুখ চোখ কুঁচকে বলল, 'Oh God!' এই বাক্যটি বলা মনে হয় তার মুদ্রা দোষ। কারণে অকারণে বলে।

এলিতা বলল, তোমার প্রিয় রঙ কি?

নীল।

এই রঙ প্রিয় হবার পেছনে কি কোনো কারণ আছে; না এমনিতেই প্রিয়।

কারণ আছে, আমাদের দৃশ্যমান জগতের বড় অংশ আকাশ। আকাশ নীল।

এলিতা বলল, তুমি শুনলে অবাক হবে আমি তোমার প্রিয় নীল রঙের একটা শাড়ি কিনেছি।

হঠাৎ শাড়ি কেন?

আমি ঠিক করে রেখেছিলাম যেদিন তোমার রোগমুক্তি হবে আমি নীল শাড়ি পরে উপস্থিত হব।

শাড়িতো পর নি।

শাড়ি পরতে যে এত কিছু লাগে জানতাম না। স্কার্টের মত আন্ডার গার্মেন্টস। টপস্-এর মত একটা ড্রেস, যাই হোক হোটেলের সাহায্যে দর্জি ডেকে ব্যবস্থা করেছি। শাড়ির অন্য অংশগুলি দর্জি এখনো দেয় নি।

আমি বললাম, কোনো অসুবিধা নেই। আমি কল্পনা করে নিচ্ছি তুমি শাড়ি পরে আমার সামনে বসে আছ। আমি খুব ভাল কল্পনা করতে পারি।

Oh God.

ও গড বলে আঁৎকে উঠলে কেন?

এলিতা গম্ভীর গলায় বলল, যে শাড়ি পরা অবস্থায় আমি বসে আছি কল্পনা করতে পারে সে নগ্ন অবস্থায় আমি বসে আছি এই কল্পনাও করতে পারে। এ জন্যেই Oh God. বলেছি। হিমু এখন আমি উঠব। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সরি।

হঠাৎ ক্ষমা প্রার্থনা কেন?

অন্য আরেক দিন বলব। আজ না। তোমাকে রিলিজ করছে কবে?

জানি না।

সমস্যা নেই। আমি জেনে নিচ্ছি। তোমাকে রিলিজ করার দিনে আমি নীল শাড়ি পরে আসব।

আচ্ছা।

হাসপাতাল থেকে মেসে ফিরেছি। নীল শাড়ি পরে এলিতার আসার কথা ছিল সে আসে নি।

আলম সাহেব ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। আমি এসেছি জেনেও তিনি দরজা খুললেন না। আমার রোগমুক্তির জন্যে তিনি এক হাজার রাকাত নামাজ মানত করেছেন। দিনে ৭০ রাকাত থেকে ১০০ রাকাতের বেশি পড়তে পারেন না বলে মানত মাঝামাঝি পর্যায়ে আছে। মানত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি দরজা খুলবেন না।

কাদেরের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

আমি হাসপাতালে ভর্তির দিন থেকে না-কি সে নিখোঁজ।

দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকা অনেকটা বিদেশ বাসের মত। বিদেশ ভ্রমণ শেষ হলে দেশে ফেরার জন্যে প্রাণ ঘ্যান ঘ্যান শুরু করে।

মেসে পা দিয়েও আমার প্রাণের ঘ্যানঘ্যানানি দূর হল না। ঢাকার পথে ঘাটে ঘুরতে ইচ্ছা করল। শরীরের এই অবস্থায় 'হন্টন' প্রক্রিয়া সম্ভব না। আমি সারা দিনের জন্যে রিকশা ভাড়া করলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত রিকশা নিয়ে ঘুরবে বিনিময়ে আমার সঙ্গে টাকা পয়সা যা আছে সব তাকে দিয়ে দেব। অনেকটা জুয়া খেলার মত।

রিকশাওয়ালা মধ্যবয়স্ক, নাম ইছহাক। সে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে রাজি হল। মিনমিনে গলায় বলল, চা নাশতা দুপুরের খানা এইগুলা কার?

আমি বললাম সব তোমার। আমার খাওয়ার পয়সাও তুমি দেবে। রাজি আছ?

ইছহাক বলল, স্যার উঠেন।

রিকশা নিয়ে ঘণ্টাখানেক শহরে ঘুরে মাজেদা খালার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

মাজেদা খালা বাসায় ছিলেন না। খালু সাহেব ছিলেন, তিনি আমাকে দেখেই বললেন, তোমার খালা বাসায় নেই। দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবে না।

আমি বললাম, আপনারা আছেন কেমন?

ভাল আছি। এখন বিদায় হও।

বিদায় হলাম। মাজেদা খালা এবং খালু আমার অসুখের খবর পান নি।

পরের স্টেশন বাদলদের বাড়ি। সেখানে বিরাট হৈ চৈ। মেজো খালু চার ব্যাগ বাজার নিয়ে ফিরেছেন। গাড়ি থেকে নেমেছে তিন ব্যাগ। আরেকটার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। খালু সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, এখন ঝামেলায় আছি, বিদায় হও তো।

আমি বললাম, দুপুরে আপনার এখানে খাব ভেবেছিলাম। সঙ্গে একজন গেস্ট আছে। আমার রিকশাওয়ালা বারান্দায় খাবার দিলেই হবে।

গেট লস্ট, গেট লস্ট।

ইছহাক আমাকে দুপুরের খাবার খাওয়ালো রাস্তার পাশের রেষ্টুরেন্টে। ইট বিছিয়ে খাবার দেয়া হয় বলে এইসব রেষ্টুরেন্টের আরেক নাম ইটালিয়ান রেষ্টুরেন্ট।

আগুন গরম মোটা মোটা রুটি।

হিদুল শুটকির জিভ পুরে যাওয়ার মত ঝাল ভর্তা।

মুরগির গিলা কলিজা।

ইছহাক বলল, স্যার পেট পুরা হইছে?

আমি বললাম, আরাম করে খেয়েছি ইছহাক।

ইছহাক বলল, এখন ডাবল জর্দা দিয়ে একটা পান মুখে দিয়া একটা ছিরগেট ধরান। দেখবেন দুনিয়ার মধ্যে বেহেশত নামব। দশ পনরো মিনিট শুইয়া কি বিশ্রাম নিবেন?

বিশ্রাম নিতে পারলে ভাল হয়।

রেষ্টুরেন্টের সঙ্গেই নীল রঙের পলিথিনে তাঁবুর মত ঘর। মেঝেতে শীতল পাটি এবং বালিশ। বালিশ পরিষ্কার। আধঘণ্টার জন্যে বিশ্রামের ভাড়া দশ টাকা। ইছহাক দশ টাকা দিয়ে আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করল।

ডবল জর্দার পান এবং সিগারেট হাতে আমি বিশ্রামে গেলাম। আধঘণ্টার জায়গায় এক ঘণ্টা কাটিয়ে ফিরলাম। ইছহাক রিকশার সীটে বসে চা খাচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, আরাম হইছে স্যার।

আমি বললাম আরাম হয়েছে। মাঝে মাঝে এখানে বিশ্রামে আসব। ইছহাক এখন মূল কথা শোন। আমার কাছে টাকা পয়সা কিছুই নাই। চুক্তিমত তুমি আমাকে আমার মেসে নামিয়ে চলে যাবে।

ইছহাকের কোনো ভাবান্তর হল না। হাসিমুখে বলল স্যার কোনো অসুবিধা নাই। একটা ঘটনা শুনেন স্যার পাঁচ ছয় বছর আগের কথা। আপনের মত চুক্তিতে এক স্যার আমার রিকশায় উঠল। সন্ধ্যাবেলা রিকশা থাইকা নাইমা বলল, এই নাও আমার কাছে এগারো হাজার টাকা আছে। নিয়ে যাও। মালিকের রিকশা আর চালাবা না। নতুন রিকশা কিনবা।

আমি নয়া রিকশা খরিদ করেছি। শাদী করেছি। ঘটনাটা কি এখন আপনার ইয়াদ হইছে?

না।

আপনারে চিনতে আমার দেরী হয়েছে। আমার দোষ নাই। আপনার চেহারা নষ্ট। দেইখা মনে হয় ছায়ার কচু গাছ। গায়ে চাদ্দর থাকনে হলুদ পাঞ্জাবি চোখে পড়ে নাই। স্যার ভাল আছেন?

ভাল আছি।

শহরে ঘুরতে ইচ্ছা করলেই মোবাইলে মিস কল দিবেন চইলা আসব। নয়া মোবাইল খরিদ করেছি।

ইছহাক আমার মোবাইল নাই।

আচ্ছা যান ডিউটিতে বাহির হইয়া প্রথম আপনের খোঁজ নিব।

কোন প্রয়োজন নাই ইছহাক। মাঝে মাঝে দেখা হওয়াই ভাল।

ইছহাক বলল, আপনের শরীর বেশি খারাপ করেছে। শরীরের যত্ন নিবেন। গরীবের এই অনুরোধ।

রাশিয়ান পরী আমাকে দীর্ঘ এক চিঠি লিখেছেন। চিঠি ডাকে বা কুরিয়ার সার্ভিসে আসে নি। আমার অনুপস্থিতিতে সে নিজেই এসে দিয়ে গেছে। চিঠি ইংরেজিতে লেখা। মাঝে মাঝে কিছু বাংলা শব্দ ঢুকেছে। তার বাংলায় যে কোন উন্নতি হয়েছে তা বলা যাবে না। প্রিয় হিমু লিখতে গিয়ে লিখেছে 'পিত্ত হিমু।' আমি মোটামুটি ঠিক করে দিলাম।

এলিতার চিঠি

প্রিয় হিমু,

তোমার দীর্ঘরোগভোগের পেছনে আমার ভূমিকা আছে। আগে ব্যাখ্যা করি। ধোঁয়া বাবাকে দিয়ে শুরু করা যাক। আমি যখন ক্যামেরা ফেরত পেলাম তখনই বুঝলাম লোকটি ভয়ংকর এক ক্রিমিন্যাল। ঢাকা ক্রাইম ওয়ার্ল্ডের গড ফাদার। তা-না হলে হারানো ক্যামেরা এত দ্রুত আমার হাতে আসবে না। কিন্তু আমি ভান করলাম ধোঁয়া বাবার অলৌকিক ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ। আমি তার শিষ্য হবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলাম। ধোঁয়া বাবার পরিচয় আমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে এই তথ্য নিশ্চয়ই আমি জানাব না। আমার অভিনয় ভাল হয়েছিল। মনে হয় তুমি ধরতে পার নি।

তোমার সঙ্গে এমন একজন ক্রিমিন্যালের সখ্যতার বিষয়টা কিছুই বুঝলাম না। একজন সাধুর সঙ্গে পরিচয় হবে একজন সাধুর। ক্রিমিন্যাল চিনবে ক্রিমিন্যালকে।

তোমার কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটি আমি জানতে চাচ্ছিলাম বলেই তোমাকে রাতে হোটেলে থেকে যেতে বলি। আমার যৌন সঙ্গী হবার জন্যে না।

আমার প্রস্তাব শুনে তুমি অবাক হলে, আহত হলে এবং লজ্জিত হলে। আমার ধারণা তুমি ঘৃণাবোধও করেছ। তোমার সেই দৃষ্টি এখনো আমার চোখে ভাসে।

ঝড় বৃষ্টির রাতে তুমি বের হয়ে গেলে এবং নিজেকে কষ্ট দেবার জন্যে সারারাত বৃষ্টিতে ভিজলে। কি করে জানলাম? নিজেকে কষ্ট দেবার এই ধরনের প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আমি কয়েকবার গিয়েছি। একবারের কথা বলি, মা'র উপর রাগ করে তুষারপাতের মধ্যেই ঘর ছেড়ে বের হয়েছি। অর্ধমৃত অবস্থায় পুলিশ আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হিমু শোন! আমি একজন ব্রোকেন পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা স্কুলের ফুটবল কোচ ছিলেন। এলকোহলিক হবার কারণে তার চাকরি চলে যায়। চরম অর্থনৈতিক সংকটে আমি এবং মা দিশাহারা হয়ে যাই। মা সমস্যার সুন্দর সমাধান করেন। তিনি বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ফোস্টার পিতামাতার কাছে।

আমার রূপ আমার কাল হয়ে দাঁড়ায়। তের বছর বয়সে আমার ফোস্টার পিতা এক দুপুরে আমার শোবার ঘরে ঢুকেন। দরজা বন্ধ করে আমার মুখ চেপে ধরেন যাতে আমি শব্দ করতে না পারি। আমার ফোস্টার মা বাড়িতে ছিলেন না। তিনি তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

এই ঘটনা আমি গোপন করে যাই। আমি আমার ফোস্টার মা'কে কষ্ট দিতে চাই নি। আমি সরকারের কাছ কোনো কারণ না দেখিয়েই ফোস্টার পরিবার বদলবার আবেদন করি।

এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারে সেখান থেকে অন্য জায়গায় এমন চলতেই থাকে। সব জায়গায় যে একই ঘটনা ঘটেছে তা না। আমার ভিতর তখন অস্থিরতা কাজ করছিল।

আমি আমার নারী সত্তার উপর এতই বিরক্ত হই যে পুরুষের পোশাক পরতে শুরু করি। নিজেকে পরিচয় দিতাম পুরুষ হিসেবে। আমার পুরুষ নাম ছিল 'পিটার'। এই নাম আমি নিয়েছি পিটার দ্য গ্রেটের কাছ থেকে।

রাশিয়ান জার পিটার দ্য গ্রেটকে নিশ্চয়ই চেন। তোমার ব্যাপক পড়াশোনা, না চেনার কথা না। এই মহান জার রাজকীয় নৌকায় করে প্রমোদ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। হঠাৎ দেখলেন দূরে একটা সাধারণ জেলে নৌকা ডুবে যাচ্ছে। নৌকার আরোহী একটা বাচ্চা ছেলে সাঁতার না জানার কারণে ডুবে যাচ্ছে। পিটার তাকে রক্ষা করার জন্যে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শিশুটি উদ্ধার পেল কিন্তু পিটার দ্য গ্রেট মারা গেলেন।

পুরুষ হতে গেলে এমন পুরুষই হতে হয়। তোমার মত পুতু পুতু পুরুষ না। বৃষ্টির পানি মাথায় লাগানো পনেরো দিনের জন্যে জ্বরে পড়ে কুঁ কুঁ করতে লাগলে।

তোমাকে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম কারণ পরশু ভোরবেলা আমি চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করছে না।

এই চিঠি লিখতে লিখতে একবার মনে হচ্ছে কি দরকার ফিরে গিয়ে। অদ্ভুত সুন্দর এই দরিদ্র দেশটায় থেকে যাই না কেন। যে হিমু আমার সঙ্গে Hide and seek খেলছে তাকে গোপন কামরা থেকে খুঁজে বের করে আনি।

আমি যখন হাইস্কুলে পড়ি তখন একটি প্রেমপত্র পাই। শুনলে অবাক হবে আমি পুরুষদের ভাষ্যমতে ভয়ংকর রূপবতী হলেও একটি প্রেমপত্র ছাড়া দ্বিতীয় প্রেমপত্র পাই নি। প্রেমপত্রটি কে পাঠিয়েছে তাও কিন্তু অজানা। বেচারা সম্ভবত নিজেকে প্রকাশিত করতে লজ্জাবোধ করছে। সে যাই হোক প্রেমপত্রে একটা কবিতা লেখা ছিল।

I am your man
That is what I am
And I am hare to do
Whater I can.

সুন্দরভাবে কবিতা না? 'এই মেয়ে শোন। আমি তোমার পুরুষ। তোমার জন্যে সম্ভব যা কিছু সবই আমি করব।

আমি সুন্দর রেডিও বন্ড কাগজে এই চিঠির একটি জবাব লিখে রেখেছি।

I am your girl
that is what I am
And I am here to do
Whater I can.

এখন ভাবছি এই জবাবটা তোমাকে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। ভয় নেই, ঠাট্টা করছি।

এখন কি তুমি আমাকে কিছুটা বুঝতে পারছ? সাধারণত দেখা যায় একজন মানুষ অন্য একজনকে বুঝতে পারে না। মূল কারণ 'হাইড এন্ড সিক' গেম। মানুষ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে। সে চায় অন্যরা তাকে খুঁজে বের করুক।

তোমাকে আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না। একদিকে ধোঁয়া বাবার মত ভয়ংকর অপরাধীর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব অন্যদিকে মানুষের প্রতি তোমার মমতা। তানিজা মেয়েটির কথা ভাব। তুমি চমৎকারভাবে তাদের বাবা মা'র সমস্যার সমাধান করে দিলে। Fairy tale এর মত তারা এখন সুখে আছে। এর মধ্যে তারা একদিন আমাকে লাঞ্চ খাইয়েছে। সারাদিন তাদের সঙ্গে থেকেছি রাতেও থাকতে হয়েছে। কারণ তানিজা মেয়েটি কিছুতেই আমাকে হোটেলে ফিরতে দেবে না।

এই মেয়েটির মত আমারো বাবা মা'কে নিয়ে একটি সুখের সংসার হতে পারত। হয়নি কারণ সেখানে হিমু বলে কেউ ছিল না।

তোমার আশেপাশে যারা থাকে তারা তোমাকে কি চোখে দেখে তা নিশ্চয়ই তুমি জান। একটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। একদিন কাদেরের সঙ্গে গল্প করছি কি প্রসঙ্গে যেন তোমার কথা উঠল। আমি বললাম, তোমার হিমু ভাইজান একজন ধান্ধাবাজ বদ লোক। কাদের বলল, হিমু ভাইজানেরে নিয়া কেউ যদি মন্দ কথা বলে আমি তার কল্লা ফালায়ে দিব।

আমি বললাম, সত্যি কল্লা ফেলবে।

কাদের বলল, অবশ্যই। মাটির কসম, পানির কসম আর আগুনের কসম।

আমি ফলের ঝুরিতে রাখা ছুরি বের করে বললাম, এই নাও ছুড়ি। এখন আমার কল্লা ফেল। সে ছুড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার চোখে আগুন ঝক ঝক করছে। ঠিকমত দেখাশোনা না করলে এই ছেলেটি কিন্তু ভয়ংকর সন্ত্রাসী হয়ে বের হবে। সম্ভব হলে আমি তাকে নিয়ে আমেরিকা চলে যেতাম।

এই ছেলেটির জন্যে কিছু কি করা যায়? কাদের আমাকে কি ডাকে জান? 'মাইজি'। আমি বললাম 'মাইজি' শব্দের মানে কি?

সে জবাব দেয় না। হোটেলের বাঙালি কর্মচারীদের কাছে শুনলাম, মাইজি মানে মা। একটি অজানা অচেনা ছেলে দিনের পর দিন আমাকে মা ডেকে যাচ্ছে আর আমি বুঝতেই পারি নি। আশ্চর্য না?

কাদেরের জন্যে আমি দশ হাজার ডলার রেখে যাচ্ছি। তুমি ব্যবস্থা করো।

তুমি ভাল থেকো।

এলিতা।

আলমের বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে। তার মানতের নামাজ আগেই শেষ হয়েছিল এখন আবার নতুন কোনো মানতের নামাজ শুরু হয়েছে। দরজা জানালা পুরোপুরি বন্ধ। গভীর রাতে আলমের ঘর থেকে ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। গন্ধের সঙ্গে হুঁ হুঁ শব্দও ভেসে আসে। হুঁ হুঁ শব্দের কারণ পরিষ্কার না, জিগির হতে পারে।

আলমের ছোট ভাই বদরুল ভাইয়ের খোঁজ এসে 'টাসকি' খেয়েছে। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ভাইজান আপনার কি হয়েছে?

আলম উদাস গলায় বলল, কিছু হয় নাই। ধর্ম কর্ম নিয়া আছি। মাঝে মাঝে চিন্তার জগতে যেতে হয়। চিন্তার জগৎ বড়ই বিচিত্র।

এমনতো আপনি ছিলেন না।

আলম উপদেশ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, সব মানুষের জীবনে একবার একটা ঘটনা ঘটে। তখন শুরু হয় সমস্যা। লাইন বদল হয়।

বদরুল বলল, লাইন বদল হয় মানে কি?

আলম দুলতে দুলতে বলল, (যে কোনো কথা বলার সময় সে ধর্মগ্রন্থ পড়ার সময় যে দুলুনিতে মানুষ দুলে, সেই ভাবে দুলে।) ট্রেইন এক লাইনে চলে লাইন বদল করা ট্রেইনের পক্ষে সম্ভব না। মানুষ ট্রেইনের মত এক লাইনে চলে। তবে বিশেষ ঘটনার পর নতুন লাইন পাওয়া যায়।

আপনিতো পীর ফকিরের মত কথা বলা শুরু করেছেন।

চিন্তা ভাবনা করে কথা বলি বলে এ রকম মনে হয়।

বদরুল বলল, আপনার জীবনে বিশেষ কি ঘটনা ঘটেছিল যে আপনি এমন হয়েছেন?

আলম হাই তুলতে তুলতে বলল, একজোড়া জুতা ছিনতাই করেছিলাম। সেই থেকে শুরু। ব্রাউন কালারের চামড়ার জুতা। অন্য কালারের জুতা ছিনতাই করলে হয়ত এ রকম হত না। তুচ্ছ ঘটনার বড় পরিবর্তন হয়। এটা আমি চিন্তার মাধ্যমে পেয়েছি।

বদরুল বলল, প্রয়োজনে আরেকবার জুতা ছিনতাই করে ঝামেলা কাটান দেন। আপনারে দেখে ভয় লাগতেছে। ইয়া মাবুদ! কি মানুষ ছিলেন কি হইছেন। চলেন আমার সঙ্গে দেশে যাই।

আলম বলল, একটা চিন্তার মধ্যে আছি, চিন্তা শেষ হোক তারপর যাব ইনশাল্লাহ।

কি চিন্তার মধ্যে আছেন?

দুনিয়ার সব মানুষ যদি ভাল হয়ে যেত তাহলে দুনিয়ার অবস্থাটা কি হত সেটা নিয়ে একটা চিন্তা।

বদরুল হতভম্ব গলায় বলল, লাইলাহা ইল্লালাহ আপনেরতো মাথাও খারাপ হয়ে গেছে। মাথায় পাগলের তেল দিয়ে ছায়াতে বসায়ে রাখতে হবে।

আলম বলল, একদিনে অধিক কথা বলে ফেলেছি। আর কথা বলব না। এখন বিদায় হও।

বদরুল হতাশ হয়ে বিদায় নিল।

আলমের বিষয়টা নিয়ে আমি এখনো চিন্তিত হবার মত কিছু দেখছি না। সব মানুষই জীবনে একবার হলেও পাগলমীর দিকে যেতে থাকে। এক সময় নিজেই ব্রেক কশে। আবার আগের অবস্থানে ফিরে।

আমার কাছে সমস্যা অনেক বেশি মনে হচ্ছে কাদেরের। সে চোখ উঠা রোগ নিয়ে ফিরেছে। দুই চোখ শুকনা মরিচের মত লাল। মাথা কামিয়ে ফেলেছে। তার কথাবার্তাও খানিকটা এলেমেলো।

আমি বললাম, খুন করার যে কথা ছিল সেটা করেছিস?

না।

সুযোগ পাস নাই?

সুযোগ ছিল।

সুযোগ মিস করলি কেন? সুযোগতো সব সময় পাওয়া যায় না। সাহসের সমস্যা?

আমার সাহসের অভাব নাই। ঘটনা আমি এক মাসের মধ্যে ঘটাব।

যে তোর হাতে খুন হবে সে কি এটা জানে?

না।

তাকে জানানো উচিত না? তুই সাহসী মানুষ। সাহসী মানুষ গোপনে কিছু করে না।

কাদের মুখ বিকৃত করে বলল, আপনেতো আমারে ভাল ঝামেলায় ফেলছেন।

এত বড় ঘটনা ঘটাবি। আর ঝামেলা নিবি না?

কাদের হতাশ চোখে তাকাচ্ছে। টকটকে লাল চোখের কারণে তার হতাশাটা অন্য রকম লাগছে।

তোর চোখের যে অবস্থা ডাক্তারের কাছে যা।

কাদের বলল, ডাক্তার লাগবে না। পীর সাহেব ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন। চোখ কটকট করতেছিল, পীর সাহেবের এক ফুঁয়ে কটকট ভাব শেষ। এখন আরামে আছি।

পীর কোথায় পেয়েছিস?

কাদের উদাস গলায় বলল, ঘরের পীর। আলম স্যার। উনার মধ্যে পীরাতি নাজেল হয়েছে।

বলিস কি?

কাদের দুঃখিত গলায় বলল, ঘরের পীরের ভাত নাই। এইটাই নিয়ম। উনারে এখন সবাই চিনে। আপনার পাশের ঘরে থাকে, আপনি চিনেন না।

এলিতা দেশে চলে যাবে। তাকে বিদায় দিতে এয়ারপোর্টে যাব। কাদেরকে বললাম, যাবি আমার সঙ্গে?

নাহ।

না কেন? এই মেয়েটা তোকে এত পছন্দ করে।

কাদের বলল, শাদা চামড়ার মানুষের অন্তর থাকে কালা। কালা অন্তরের মানুষের সঙ্গে কাদের মিশে না।

আলমকে বললাম, আপনি চলুন। এলিতাকে এয়াপোর্টে হ্যালো বলে আসি।

আলম বলল, আপনি একলাই যান। আমি একটা বিশেষ চিন্তায় আছি।

আমি বললাম, সব মানুষ ভাল হয়ে গেলে পৃথিবীর কি হত এই চিন্তা?

হুঁ।

আমি বললাম, চিন্তাটা জরুরি। আপনি চিন্তা করতে থাকুন, আমি একাই যাই।

আপনি একা যাবেন এটা আবার মনে সায় দিতেছে না। চলেন যাই। চিন্তা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকুক।

আলম যাচ্ছে শুনে কাদেরও নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজি হল।

আমরা এয়ারপোর্টে উপস্থিত হয়েছি। বিদায় পর্ব শেষ হয়েছে। এলিতা ইমিগ্রেশনে ঢুকতে যাবে। তখন সামান্য ঝামেলা হল। আলম হেঁচকি তুলে কাঁদতে শুরু করল।

এলিতা বলল, কি হয়েছে?

আপনি চলে যাবেন মনটা মানতেছে না।

এলিতা বলল, কাঁদবেন না প্লীজ। একজন বয়স্ক মানুষ কাঁদছে দেখতে খুব খারাপ লাগছে।

আলম কান্নার সঙ্গে শুরু করল হেঁচকি। এলিতা বলল, আরে কি আশ্চর্য! এই পর্যায়ে আলম মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেল। কাদের এতক্ষণ চুপচাপ ছিল এখন সেও আসরে নামল। এলিতাকে হঠাৎ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, মাইজি! আপনেরে যাইতে দিব না।

আমাদের চারপাশে লোক জমে গেল। সিকিউরিটির দু'জন এসে এলিতাকে বলল, কি সমস্যা?

এলিতা বলল, কোন সমস্যা না। এরা আমাকে যেতে দিবে না।

সিকিউরিটির লোক বলল, যেতে দিবে না মানে? মেরে হাড্ডি গুড়া করে দিব। আপনি ইমিগ্রেশনে ঢুকে পড়ুন। আমরা দেখছি।

এলিতা বলল, আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আমি ফ্লাইট ক্যানসেল করব। এরা যেদিন আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিবে সেদিনই যাব। তার আগে যাব না। I promise.

এলিতা এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি আমাদের মেসে এসে উঠেছে। আমি আমার ঘরটা তাকে ছেড়ে দিয়েছি। মেস জীবনের সঙ্গে সে চমৎকারভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। কাদের তার ঘরেই মেঝেতে বিছানা করে ঘুমায়। ঘুম ভাঙ্গার পর শুরু হয় দু'জনে যৌথ ঘর পরিষ্কার। হার্ডওয়ারের দোকান থেকে এলিতা হ্যান্ড মপ, ফিনাইল, ব্রাস এইসব কিনেছে। প্রতিদিনই সে বাথরুমও পরিষ্কার করে। মেসের অন্য বোর্ডাররা ভাল লজ্জায় পড়েছে। তারা বলছে, ম্যাডাম আপনি কেন এই কাজ করবেন? এলিতা বলেছে, আমি একাতো করব না। আপনারাও করবেন।

মেসের রান্নাঘর পরিষ্কার হয়েছে। ডাইনিং ঘর এখন ঝকঝক করছে। মেস ম্যানেজার শামসুদ্দিন হতাশ গলায় বলে, হিমু ভাইজানের মেমসাব তো ভাল বিপদে ফেলছে। জুতা পায়ে দিয়া ডাইনিং ঘরে ঢুকা যাবে না এটা কেমন কথা? ডাইনিং ঘরতো মসজিদ না।

এলিতা নিজের খরচে প্রচুর স্যান্ডেল কিনেছে। স্যান্ডেল নাম্বার দেওয়া। যে গুলিতে নাম্বার ওয়ান লেখা সেগুলি বাথরুমে যাবার স্যান্ডেল। যেগুলিতে নাম্বার টু লেখা সেগুলি ডাইনিং ঢোকার সময় পরতে হবে।

মেস ম্যানেজার শামসুদ্দিন বলেছে, এই ম্যাডাম যেদিন বিদায় হবে সেদিন আমি দশজন ফকির খাওয়াব আর মিলাদ দিব।

শামসুদ্দিনের বিরক্ত হবার ভালই কারণ আছে। সন্ধ্যার পর থেকে তার ঘর চলে যাচ্ছে এলিতার দখলে। সেখানে এলিতার নাইট স্কুল। স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা মাত্র দুই। কাদের, এবং মেসের বাবুর্চির এসিসেটন্ট জরিনা। জরিনাও কাদেরের মত এলিতাকে ডাকে মাইজি। জরিনার বয়স চল্লিশ। এই বয়সে তার পড়াশোনার আগ্রহ দেখে এলিতা মুগ্ধ।

নৈশ স্কুল চলাকালীন সময় শামসুদ্দিন তার অফিস ঘরের বাইরে টুল পেতে বসে থাকে। হতাশগলায় বিড় বিড় করে, "স্কুল এইখানে থামবে না। আরো পুলাপান যুক্ত হবে। আলমত পাইতেছি। আমি গেছি।"

আলমের পীরাতির খবরও ছড়িয়েছে। তার কাছে দোয়া নিতে লোকজন আসছে। আলম দোয়া প্রার্থীদের মাথায় হাত রেখে দীর্ঘ দোয়া করে। এই সময় তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে থাকে।

পীররা বিশেষ নামে পরিচিত হন। আলমের নাম হয়েছে অশ্রু ভাইপীর। কথায় কথায় তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে বলে এই নাম।

অবস্থা যে দিকে যাচ্ছে তাতে মনে হয় অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যাবে তার ভক্তরা অশ্রুভাই পীরের জন্যে হুজরা খানা বানিয়ে দেবে। বাৎসরিক উরস হবে। বাস ভর্তি মুরিদরা আসবে।

একদিন পেনসিল ওসি সাহেব আমাকে খবর পাঠিয়ে থানায় নিয়ে গেলেন। গলা নামিয়ে বললেন, আলতা মেয়েটার উদ্দেশ্যটা কি বলুনতো শুনি। দয়া করে ঝেড়ে কাশবেন।

আমি বললাম, আলতা আপনার স্ত্রী। তার উদ্দেশ্য আমার চেয়ে আপনার ভাল জানার কথা।

ওসি সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, এলিতা বলতে গিয়ে ভুলে আলতা বলেছি। দু'জনের নামের মধ্যের মিলটা কি লক্ষ্য করেছেন?

হুঁ।

আলতা বেঁচে থাকলে দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ছবি নিতাম।

আলতাভাবী মারা গেছেন কবে?

বিয়ের রাতে মারা গেছেরে ভাই। বিষ খেয়ে মারা গেছে। তার অন্য একজনকে পছন্দ ছিল। তার বাবা-মা আমার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়েছিল। আমি কিছুই জানতাম না। হাসপাতালে আলতার মাথা কোলে নিয়ে বসেছিলাম। কি কষ্টের মৃত্যু চোখের সামনে দেখলাম।

ওসি সাহেবের চোখে পানি এসে গিয়েছিল তিনি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, এলিতা মেয়েটা কিন্তু পুলিশের নজরদারিতে আছে। তার বিষয়ে সাবধান। [www.MurchOna.org]

সাবধান কেন?

অনেক বছর আগে অতি রূপবতী এক আমেরিকান তরুণী বাংলাদেশে এসেছিল। প্রচুর ড্রাগ সহ ধরা পড়েছিল। মেয়েটার যাবতজীবন কারাদণ্ড

হয়েছিল। আমেরিকার এক সিনেটারের চেষ্টায় মেয়েটা পাঁচ বছর জেল খাটার পর মুক্তি পায়।

আপনার কি ধরণা এলিতাও এরকম কেউ?

কথার কথা বললাম ভাই। পুলিশে চাকরি করার কারণে মন হয়েছে ছোট। মানুষের ভালটা চোখে পড়ে না। শুধু মন্দটা চোখে পড়ে। সরি।

আমাকে ডেকেছেন কি এলিতার বিষয়ে সাবধান করার জন্যে?

না না। একজন হাজতি আপনার জন্য ব্যস্ত। একবার শুধু দেখা করতে চায়।

ধোঁয়া বাবাকে ধরেছেন?

হুঁ।

মনে হচ্ছে আরেক বার পুলিশ মেডেল পাবেন।

পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ধোঁয়া বাবা কঠিন জিনিস। সে গোপনে কি কথা না-কি আপনাকে বলবে। গোপন কথাটা শুনে এসে যদি আমাকে বলেন খুশি হব। না বললেও ক্ষতি নাই। পেটে গুতা দিয়ে কথা বের করব।

ধোঁয়া বাবা একা ধরা পড়ে নাই। দলবল সহই ধরা পড়েছে। তার সাগরেদরা তাকে ঘিরে রেখেছে। আমি হাজতের শিক ধরে দাঁড়াতেই ধোঁয়া বাবা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফিস ফিস করে গোপন কথাটা বললেন। আমি গোপনে কথা শুনে চলে এসেছি। আমি হিমু, হিমুদের অনেক গোপনে কথা শুনতে হয়। গোপন কথা গোপন রাখাই হিমুদের নিয়ম।

আমি আমার পুরানো হন্টন জীবন শুরু করেছি। কোনো কোনো রাতে মেসে ফেরা হয় না। হঠাৎ হঠাৎ এলিতা আমার সঙ্গে বের হয়। তখন দূর থেকে পুলিশের একটা গাড়ি আমাদের অনুসরণ করে। গাড়িতে বসে থাকেন পেনসিল ওসি সাহেব। তিনি কি পুলিশ নজরদারির কারণে অনুসরণ করেন, না-কি তাঁর মৃত স্ত্রীর ছায়ার পেছনে পেছনে যান? এর উত্তর জানা নেই।

পথে হাঁটার সময় এলিতা অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। সব কথাই তার বাবাকে নিয়ে। একবার বলল, আমার মনের অনেক কষ্টের মধ্যে একটি কষ্ট হল বাবা কখনো আমাকে আদর করে কোলে নেয় নি। বাবার ধারণা ছিল আমি তাঁর মেয়ে না। অথচ আমি দেখতে বাবার মত। বাবার বুকে ডানদিকে জন্ম দাগ

আছে। ইংরেজি ছোট অক্ষরের 'e' -র মত। আমারো আছে। তুমি দেখতে চাইলে দেখাব। দেখতে চাও?

না।

এই 'e' লেখার মানে কি কে জানে।

আমি বললাম, এর অর্থ eternity. তোমারা দু'জন eternity পর্যন্ত যুক্ত।

এলিতা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সুন্দর বলেছ। মৃত্যুর আগে আগে বাবা তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি লিখেছিলেন।

আমি বললাম, কি লেখা সেই চিঠিতে? নিশ্চয়ই চিঠি তোমার মুখস্ত। বল শুনি।

এলিতা বলল, চিঠিটা অবশ্যই আমার মুখস্ত। তোমাকে শুনালেই আমি কাঁদতে থাকব। এখন আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে না।

আমি বললাম, প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে যখন কাঁদতে ইচ্ছা করে না তখন কাঁদতে হয়।

এলিতা বলল, বাবা লিখেছেন– মা আমার ভুল হয়েছে। ভুল করাটাই আমার জন্যে স্বাভাবিক। কিছু কিছু মানুষের জন্ম হয় ভুল করার জন্যে। আমি সেই দুর্ভাগাদের একজন। মা আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা করো না। আমি তোমার ক্ষমার যোগ্য না।

এলিতা কাঁদছে। সে চোখ মুছতে মুছতে বলল, অনেকদিন পর কাঁদলাম। এখন হাসতে ইচ্ছা করছে। আমাকে হাসাতে পারবে?

এলিতাকে হাসানোর জন্যে কিছু করতে হল না এলিতা নিজেই খিলখিল করে হাসতে শুরু করল।

একদিন এলিতাকে নিয়ে মাজেদা খালার বাড়িতে গেলাম। মাজেদা খালা বললেন, "হিমু এই মাগিতো তোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।"

আমি বললাম, খালা সাবধান। এলিতা এখন সব বাংলা বুঝে এবং বলতে পারে।

মাজেদা খালা হকচকিয়ে গেলেন। এলিতা হাসতে হাসতে বলল, মাগি'র অর্থ মেয়ে মানুষ। কিন্তু এই শব্দটা খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে আমি আপনার কথায় কিছু মনে করি নি।

খালু সাহেব এলিতার সঙ্গে আমেরিকান অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ শুরু করলেন। প্রেসিডেন্ট বুশ এবং বারাক ওবামা বিষয়ে জটিল আলোচনায় চলে গেলেন।

এই ফাঁকে আমি খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, খালু সাহবের মানি ব্যাগে যে নাম্বার পাওয়া গেছে তার সর্বশেষ অবস্থা কি? যার নাম্বার তাকে আইডেনটিফাই করা গেছে?

খালা বিরস গলায়, বললেন, হ্যাঁ। যার নাম্বার সেই হারামজাদা নিউমার্কেটের কসাই। গরুর মাংস বিক্রি করে। তোর খালু তার কাছ থেকে মাংস কিনে মেজাজ এমন খারাপ হয়েছে। এই খবর বের করতে চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করেছি। বাদ দে কসাইটার কথা, তোদের মেসে না-কি অতিক্ষমতাধর এক পীর সাহেব থাকেন। অশ্রুবাবা নাম।

অশ্রুবাবা না, অশ্রুভাই। বাবা পর্যায়ে উনি এখনো উঠতে পারেন নি।

খালা গলা নামিয়ে বললেন, তার কাছ থেকে তাবিজ এনে দিতে পারবি? মাথার চুল পড়া বন্ধ হবার তাবিজ। মাথার সব চুল পড়ে যাচ্ছে।

যথা সময়ে তাবিজ পাবে। উরসের দাওয়াতের চিঠিও পাবে।

এক বৃষ্টির রাতে আমি এলিতাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে বের হলাম। এলিতা বলল, হিমু আমার কখনো ফ্যামিলি বলে কিছু ছিল না। এখন মনে হচ্ছে, I have a family.

আমি বললাম, পরিবার মানেই তো যন্ত্রণা। সুখী সেই জন যার কেউ নেই।

এমন কেউ কি আছে যার কেউ নেই?

আমি বললাম, আছে। তারা মানুষের মতই কিন্তু মানুষ না। প্রবল ঝড় বৃষ্টির রাতে এরা রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে। আমি এদের নাম দিয়েছি পক্ষীমানব। পক্ষীমানবদের চেনার উপায় হচ্ছে তাদের চোখে থাকে সানগ্লাস। হাতে গ্লাভস। তাদের হাতের আঙ্গুল পাখির নখের মত বলে এরা আঙ্গুল গ্লাভসের ভেতর লুকিয়ে রাখে।

হিমু তুমি আমায় লেগ পুলিং করছ।

না লেগ পুলিং না। আমি একবার একজনকে দেখেছি। এদের খুব চেষ্টা থাকে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার কিন্তু পারে না।

এলিতা বলল, তুমি অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বল। কোনটা বিশ্বাস করব কোনটা করব না, বুঝতে পারি না।

পক্ষীমানবদের কথা বিশ্বাস করতে পার। তাদের গলার স্বর অদ্ভুত মিষ্টি।

ঝড় বৃষ্টির রাত হলেই এলিতা আমার সঙ্গে পক্ষীমানবের সন্ধানে বের হয়।

মানব জাতির সমস্যা হচ্ছে তাকে কোনো না কোনো সন্ধানে জীবন কাটাতে হয়। অর্থের সন্ধান, বিত্তের সন্ধান, সুখের সন্ধান, ভালবাসার সন্ধান, ঈশ্বরের সন্ধান।

আমি আর এলিতা সন্ধান করছি সামান্য পক্ষীমানবের।

এলিতার একটি ছবি Toronto Photographic Association এর বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। ছবিটিতে আমি আছি। তানিজা আমাকে জমজমের পানি খাওয়াচ্ছে।